শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

(কলিকাতা গেজেট—৭ই মে, ১৯৪৮)

ঘূর্ণিপাকে

[শিশু উপন্যাস]

বাণী, শিশুনাটিকা, রূপকথা, তিব্বত ফেরত তান্ত্রিক প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

উপহার

ঘূর্ণিপাকে—

"সব আমার নিজের হাতের তৈরী" এর একটাও ফেলতে পারবে না বাবা—

ঘূর্ণিপাকে

এক

প্রমোশন হইয়া গিয়াছিল, নূতন বই তখনও কেনা হয় নাই। ছাত্র-জীবনে এই সময়টাই দু'হাত তুলিয়া নাচিয়া বেড়ানো চলে।

সকালবেলা একখানা কাগজ কিনিয়া তাহারই পৃষ্ঠা উল্টাইয়া রয়েল সার্কাসের খোঁজ করিতেছিলাম, ঠিক এমন সময় বীরেশ আসিয়া উপস্থিত।

কহিল, রন্তু, কথা আছে শোন্।

আমি কহিলাম, কিরে ব্যাপারটা কি ?

বীরেশ চুপি চুপি তাহার মুখটা আমার কাণের কাছে লইয়া আসিয়া কহিল, আমার এক জ্যাঠ্তুতো ভাই এয়েছে হরিদ্বার থেকে। আমি ভাব্ছি—যে আমরা দু'টিতে মিলে যদি ওর সঙ্গে হরিদ্বার যাই—তারপর সেখান থেকে হেঁটে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করতে বেরুই, তবে সেটা খুব একটা বীরত্বের কাজ হবে না ?

সম্প্রতি ক্লাশে উত্তর-মেরু আবিষ্কারের গল্প পড়িয়া বীরেশের সঙ্গে খুব জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম—ঠিক এই ধরণের একটা আবিষ্কার করিলে, ইতিহাসে আমাদের নাম কি রকম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। সকল দেশের ছেলেরা পরীক্ষার পড়া করিতে বসিয়া আমাদের নাম মুখস্থ করিবে—সে কত বড় একটা গৌরবের কথা!

সেই কথাটাই এতদিন ধরিয়া বোধ করি বীরেশের মাথায় ওঠা-পড়া করিয়াছে। আজ হরিদ্বারের জ্যাঠ্‌তুতো ভাই আসিয়া বোধকরি সেই উৎসাহে ইন্ধন যোগাইয়াছে।

বীরেশের উৎসাহ আছে, কিন্তু একা একা কোন কাজই মনের জোর দিয়া করিতে পারে না। তাই গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কারের কল্পনা মনে মনে স্থির করিয়াই একজন সঙ্গীর জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে আমার কাছে।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বীরেশ আমার হাত দু'খানি মুঠার মধ্যে ধরিয়া কহিল, ভাই, তোর সাহস আছে বলেই তোকে একথা বল্‌ছি। তুই থাক্‌লে আমরা তিনজনে যতটা নিশ্চিন্ত মনে বেরুতে পারবো—শুধু আমার ভাইকে নিয়ে কি ততটা সাহস হবে?

আমার সাহসের এত বড় একটি ভক্ত আছে জানিয়া মনে মনে ভারী পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

দিন তিনেক বাদেই মার সহিত মাসীর বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বীরেশের কথায় বুক ফুলিয়া দু'হাত উঁচু

হইয়া উঠিল। যাইব না একথা বলিয়া তাহার সামনে কাপুরুষ সাজিতে কিছুতেই রাজী হইলাম না।

বুক ঠুকিয়া কহিলাম, এসব কাজ হাতে পেলে আমি যে আর কিছুটি চাইনে তা-ত' তুই জানিস।

বীরেশ খুসী হইয়া কহিল, তা জানি বলেই ত' আর কারও কাছে না গিয়ে সোজা তোর কাছে চলে এসেছি। মনে মনে এ বিশ্বাস আছে যে, কেউ যদি রাজী না হয় ত' রমু নিশ্চয়ই যাবে।

বীরেশ তখনই আমাকে টানিয়া তাহার বাসায় লইয়া গিয়া তার হরিদ্বারের ভাইটীর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিল।

তিন মাথায় বসিয়া তখনই স্থির হইয়া গেল—যে কাহাকেও না জানাইয়া হরিদ্বারের টিকিট করিয়া একদিন ট্রেণে চড়িয়া বসিতে হইবে—তারপর সেখান হইতে লছমন-ঝোলা হইয়া বদরীনারায়ণের পথে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে রওনা হওয়া—সে ত' তার পরের কথা।

বয়স যদিও খুব বেশী নয়—এবং সবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছি—কিন্তু হইলে কি হইবে—ছেলেবেলা হইতেই অদেখা দেশ দেখা এবং অজানা জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিবার কৌতূহল—একটা ছিল।

একবার দেওঘরে নন্দন পাহাড়ের ওপার একটা নূতন

পাহাড় আবিষ্কার করিতে গিয়া পথ হারাইয়া একটা নেকড়ে বাঘের সম্মুখে পড়িয়া গিয়াছিলাম। একটা সাঁওতাল—লাঠি

নেকড়ে বাঘের পাল্লায়

লইয়া ছুটিয়া আসিয়া—নেকড়েটাকে তাড়া করায় সেবারকার মত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছিল।

তবু আজ হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় মত দিয়া ফেলাতে মায়ের সঙ্গে মাসীর বাড়ী যাওয়ার কথা মনে করিয়া মনের মধ্যে শুধু খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

একটা মতলব আঁটার পর আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হরিদ্বারের দাদাটি আমার পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল, এত ভাবনা কেন ভাই? শুধু শুধু ঘরের কোণে বসে থাক্‌লে কোন দিনই বড় হতে পারা যাবে না।

একবার ভেবে দেখ ত' যদি সত্যিই আমরা গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করতে পারি, তবে গোটা পৃথিবীতে কি রকম একটা সাড়া পড়ে যাবে! পরের দিনই কলিকাতার সব কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হবে—

বাঙ্গালী বালকের অদ্ভুত কৃতিত্ব! সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তিনটি বালকের—পদব্রজে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার!

প্রত্যেক কাগজে আমাদের ফটো ছাপা হবে। এলবার্ট হল, টাউন হল, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বড় বড় সভা-সমিতি করে—যখন কলিকাতার সব নাম-করা লোকেরা আমাদের গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেবে—তখন আমাদের মনের অবস্থা কি রকম হবে!

হরিদ্বারের দাদাটির কথায় খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। সত্যিই ত'! এ প্রস্তাবটি কাজে লাগাইতে পারিলে আমরা

বোধ করি একদিন হঠাৎ নামজাদা লোক হইয়া উঠিব। আর তা' ছাড়া যত সব বীরত্বের কাজ কি সব ঐ দেশের লোকই করিবে? কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে উঠিতে ছুটিল ওরাই! নায়েগ্রা প্রপাতের ভিতর তারাই সাঁতার কাটিবে—উত্তর-মেরু, দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারেরও যত গৌরব সব ওদের প্রাপ্য—বাঙ্গালীরা কি কিছুই করিতে জানে না? নিজেদের উপর ভয়ানক ধিক্কার আসিল।

টেবিলের উপর এক চাপড় মারিয়া কহিলাম—না, আর দেরী করবার কি আছে? সব তৈরী হয়ে নাও।

হরিদ্বারের দাদা খুসী হইয়া কহিল, তা হলে ভাই আর দেরী করা উচিত হবে না—আজ রাতেই ডেরাডুন এক্সপ্রেসে!

এক মুহূর্ত্তে সব ঠিক হইয়া গেল। ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম! মোটা জামা এবং টুক্-টাক্ দরকারী জিনিষ যাহা সঙ্গে না লইলে নয়—চট্‌পট্ বাঁধিয়া ফেলিলাম।

এতক্ষণ যাওয়ার আনন্দে অন্য কিছুই ভাবিবার অবসর পাই নাই। এইবার সত্যিই এই গৃহ এবং আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া অচেনা-অজানা পথে রওনা হইতে হইবে মনে করিয়া মন আপনা হইতেই ভারী হইয়া আসিল।

মায়ের নিকট হইতে কি করিয়া বিদায় লইব এই ভাবিয়া মনটা হঠাৎ সত্যিই খারাপ হইয়া গেল।

স্কুলের ছেলেরা মিলিয়া একটা ফটো তুলিয়াছিলাম,

ভাবিলাম তারই সঙ্গে একটা চিঠি লিখিয়া মায়ের হাত-বাক্সের উপর চুপ্ করিয়া রাখিয়া যাইব। কিন্তু ছবিটি খুঁজিয়া পাইলাম না।

ঠিক এমনি সময় বাহির হইতে বীরেশদের গলার আওয়াজ পাইলাম। আমার ঘরটি বাইরের দরজার কাছে। টুক্ করিয়া দরজা খুলিয়া তাহাদিগকে ভিতরে লইয়া আসিলাম। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। কহিলাম, বীরেশ, তুই ত' বেশ ছবি আঁক্‌তে পারিস! আমি আলোর সাম্‌নে দাঁড়াই,—দেওয়ালের গায় আমার যে ছায়া পড়্‌বে—তাই ধরে ধরে পেন্সিল দিয়ে চট্ করে আমার একটা ছবি এঁকে ফেল্‌ত! কারণ, আমার ত' ফটো নেই, থাক্‌লে তাই রেখে যেতাম। তাই আমি যখন এখানে থাকবো না—মা দেওয়ালের গায় আমার ঐ ছবিটি দেখে আমার কথা মনে করবে। নে, চট্‌পট্ কর্।

বীরেশ খুসী হইয়া কহিল, তোর ত' বেশ বুদ্ধি! তারপর তার পেন্সিলের টানে চমৎকার একটি রমু দেওয়ালের গায়ে আঁকা হইয়া গেল, তার তলায় তাড়াতাড়ি লিখিলাম,—

মা! তোমার কাছে বিদায় নিতে পারিলাম না, ক্ষমা কোরো। যদি ফিরে আসি—তখন তোমার ছেলের নাম—সকলের মুখে মুখে শুন্‌তে পাবে! সেই মধুর দিনটার কথা মনে করে রোজ আমায় আশীর্ব্বাদ কোরো। —রমু।

তিনজনে নিঃশব্দে যখন পুঁট্‌লী বগলে করিয়া রাস্তায়

বীরেশের পেন্সিলের টানে চমৎকার একটি রন্ধ্র দেওয়ালের গায়ে আঁকা হইয়া গেল

নামিয়া পড়িলাম—উপরের ছোট্ট একটি ঘর হইতে তখন মায়ের লক্ষ্মীর আরতির শঙ্খধ্বনি হইতেছে।

দুই

তিনজনে মিলিয়া শিকল ধরিয়া হরিদ্বারের কন্‌কনে গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে কহিলাম, সত্যি বল্‌ছি এ জায়গাটা ছেড়ে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।—যে দিকে তাকাও ধূ ধূ করে পাহাড়—আর পায়ের তলায় কন্‌কনে গঙ্গা।

হরিদ্বারের দাদাটি টুপ করিয়া আর একটা ডুব দিয়া কহিল, চমৎকার যায়গা এই হরিদ্বার। চল্‌, আজ তোদের কন্‌খল দেখিয়ে আনি—তারপর কালকেই ঋষিকেশের দিকে রওনা হওয়া যাবে।

আমি কহিলাম, কনখল! সেই যেখানে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?

সে কহিল, হ্যাঁ, গঙ্গার সেখানে তিনটে ধারা হয়ে গেছে। সেখানে দক্ষেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেখ্‌বি কত লোক পূজো দিতে যায়!

কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ধর্ম্মশালার একটি ঘর লইয়া তিনটি প্রাণী ছিলাম। দুপুর বেলায় বীরেশের তাগিদে উনুন ইত্যাদি কিনিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে খিচুড়ী রাঁধিয়া ফেলিলাম। আর হরিদ্বারের গঙ্গার জল নয় ত' হজমীগুলি। খাইলেই ক্ষুধা পায়। অপটু হাতের রাঁধায় খিচুড়ী হয়ত ভাল করিয়া

সিদ্ধই হয় নাই। ক্ষুধার চোটে তাই তিনজনে গোগ্রাসে শেষ করিয়া ফেলিলাম।

দুপুর গড়াইতেই কন্‌খলের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

হরিদ্বার হইতে কন্‌খলে যাওয়ার একা পাওয়া যায় কিন্তু দেশ দেখার প্রবল আগ্রহে আমরা হাটিয়াই চলিলাম।

পাহাড়িয়া পথে হাঁটিতে হাঁটিতে ধূলা-ভরা পা' লইয়া আমরা যখন দক্ষেশ্বর শিবের কাছে পৌঁছিলাম, সূর্য্য তখন পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

নীচে তিন দিকে গঙ্গার তিনটি ধারা ছোট-বড় পাথরের টুক্‌রার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বীরেশ ছুটিয়া গিয়া নীচেকার একটি বড় পাথরে বসিয়া গঙ্গার টল্‌টলা জলে পা' ডুবাইয়া বসিয়া রহিল।

আমি কহিলাম, আচ্ছা, আমরা যদি প্রত্নতাত্ত্বিক হতুম ত' এইখানেই হয়ত একটা মস্ত বড় আবিষ্কার করে ফেল্‌তুম।

বীরেশ উপরে আসিয়া কহিল, ঠিক কথা রন্টু,—এ একটা আবিষ্কারের যায়গাই বটে!

কিছুক্ষণ মন্দির দর্শন করিয়া তিনজনে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। হরিদ্বারের দাদাটি কোথা হইতে একটি টাঙা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিল। তিনজনে গাড়ীতে চাপিয়া গাড়োয়ানকে কহিলাম,—হরিদ্বার—কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ধর্ম্মশালা।

রাতটা সেইখানে কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতেই তিনজনে তিনটি পুঁটুলী বগল-দাবা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

সদর দরজার কাছে ধর্ম্মশালার একটি লোক বসিয়া তামাক খাইতেছে। আমাদের চলিয়া যাইতে দেখিয়া বক্‌শিস চাহিল।

কলিকাতা হইতে খুব অল্প পয়সা নিয়াই বাহির হইয়াছিলাম। পকেটে একটা সিকি ছিল, বাহির করিয়া দিলাম। লোকটি হাত পাতিয়া লইয়া আবার গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাইতে লাগিল।

যখন চলিতে সুরু করিলাম, তখনও একটু রাত আছে।

মাথার উপর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আকাশ—পায়ের নীচে হিম-শীতল বন্ধুর পথ—আমরা তিনটি বাঙালী বালক—আবিষ্কারের এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা বুকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

খানিক বাদে যাহা দেখিলাম—তাহাতে মনে হইল জীবন আমাদের সার্থক। হাতের বোঝা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বসি—এইখানেই অনন্তকাল বসিয়া থাকিয়া আকাশের এই অপূর্ব্ব মাধুরী দুই চোখ ভরিয়া দেখি!

সূর্য্য উঠিতেছিল।

কিন্তু শুধু এই দুটি কথা বলিয়া কতটুকু বোঝানো যায়?

সূর্য্যোদয় ত' কতদিন, কতভাবেই দেখিয়াছি। কিন্তু এমনটি যেন কোনদিন কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই।

পাহাড়ের সব চাইতে উঁচু চূড়াটীর আশে-পাশে কে যেন মেঘের আড়াল হইতে এক মুঠা আবীর ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল! এদিকে ওদিকে—তখনও বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আছে, কিন্তু সেই আবীরের কতকগুলি কণা বহু নীচে—যেখানে গঙ্গা ছোট ছোট পাথরের নুড়ি লইয়া খেলা করিতে করিতে অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহারই খানিকটা যায়গা অমন রাঙা করিয়া তুলিল কি করিয়া।

বীরেশ কাঁধ হইতে পুঁটুলীটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাই রন্তু, আমার আজ কবিতা লিখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে!

তাহার কথার জবাব দিবার মত ভাষা মুখে আসিল না, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করিয়া লইলাম—এইখানে আসিলে অ-কবিও বোধ করি কবি হয়।

কিন্তু পথ চলিতেই যখন বাহির হইয়াছি—তখন রাস্তার মাঝখানে পুঁটুলী ফেলিয়া কবিতা লিখিতে বসা কোন মতেই চলে না। কাজেই বীরেশকেও আবার কাঁধে বোঝা তুলিয়া লইয়া যাত্রা সুরু করিতে হইল।

একটু বেলা হইতেই দেখি আমাদের আগে এবং পেছনে বহু সন্ন্যাসী দল বাঁধিয়া বুঝি ঋষিকেশ এবং লছমনঝোলার উদ্দেশ্যেই চলিয়াছে।

আরও কিছুদূর যাইতে দুই ধারে সাধুদের ছোট ছোট

কুঁড়ে ঘর। কোন কোন কুঁড়ের ভিতর হইতে সংস্কৃত স্তোত্রের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কেউ বা কুঁড়ের সামনে ঘাসের উপর শুইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখে চমৎকার একটি নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়া মাথা আপনিই নত হইয়া আসে।

দুপ্রহরের রৌদ্র ক্রমেই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন পাথরের রাস্তাও তপ্ত হইয়া উঠিল। পথ-চলা তখন একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিল।

শুনিলাম সাম্‌নে কালী-কম্‌লী-ওয়ালার একটি ছত্র আছে। এখানে সাধুদের দুই বেলা রুটি খাইতে দেয়।

ক্ষুধা আমি কোন দিনই সহ্য করিতে পারি না। কহিলাম, চল সেইখানেই না হয় এ বেলার মত খাওয়া-দাওয়া সেরে নি।

হরিদ্বারের দাদাটি কহিল, কিন্তু তার আগে বেশ পরিবর্ত্তন করে নিতে হবে। আমরা ত' আর সাধু নই, যদি আমাদের ওখানে রুটি না দেয়।

তাই স্থির হইল। বরফ-গলা গঙ্গায় কোন রকমে স্নান শেষ করিয়া পুট্‌লী খুলিয়া তিনটি গেরুয়া কাপড় বাহির করিয়া বেমালুম সাধু সাজিয়া বসিলাম। গেরুয়া তিনটি পূর্ব্বেই হরিদ্বারের দাদাটি যথাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

তিনটি কিশোর-সাধু যখন কালী-কম্‌লী-ওয়ালার ছত্রে গিয়া রুটির জন্য হাত পাতিল—তখন তাহাদের মুখের দিকে

চাহিয়া কোনমতেই বোঝা গেল না যে, দিন চারেক আগে ইহারাই কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সাম্নে দাঁড়াইয়া মুঠি মুঠি ডাল-মুট্ খাইতেছিল।

হোক্ সাধুদের রুটি, কিন্তু ক্ষুধার সময় উহাই অমৃতের মত মনে হইল।

তাহার পর গঙ্গার ধারেই দিব্যি ছায়া-ওয়ালা একটি পাহাড়িয়া গাছ দেখিয়া তাহার তলায় কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, বুঝিতেও পারি নাই। যখন জাগিলাম—দেখিলাম সন্ধ্যা হওয়ার আর বেশী বাকি নাই।

ভাবিলাম, তাড়াতাড়ি গঙ্গার জলে হাত মুখটা ধুইয়া আসি। তারপর ওদের জাগাইয়া পা' চালাইয়া দিব।

পাহাড়ের গা বাহিয়া তর্ তর্ করিয়া গঙ্গার দিকে নামিতে-ছিলাম, হঠাৎ পিঠের উপর কাহার হাতের স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া দাঁড়াইলাম। পিছন ফিরিয়া যাহা দেখিলাম—তাহাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া মূঢ়ের মত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

মনে হইল কত যুগের রুদ্ধ আবরণ ভেদ করিয়া—অতি প্রাচীনকালের এক ঋষি—সূর্য্যের মত দীপ্ত তেজ লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, সঙ্গে এসো।

অভিভূতের মত কতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার পিছন পিছন

চলিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ চমক ভাঙিতেই দেখি সাম্‌নে একটা গুহা এবং তাহারই মুখে প্রজ্বলিত এক অগ্নিকুণ্ড।

হঠাৎ পিঠের উপর কাহার হাতের স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া দাঁড়াইলাম

ঋষিবর সেই লেলিহান অগ্নিশিখার সম্মুখে আমাকে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, হাজার বছর ধরিয়া এখানে তপস্যা করিতেছি—কিন্তু প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এখনও জানিতে পারি নাই। আমি বহুকাল হইতে সুলক্ষণযুক্ত একটি কিশোরের সন্ধান করিতেছিলাম। আজ ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তোমাকে আমি যোগবলে অতীতকালের ব্যাসদেবের আশ্রমে প্রেরণ করিব। সেইখান হইতে তুমি ধর্ম্ম-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আহরণ করিয়া বৃহস্পতি-পুত্র কচের মত যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পার, আমি তার ব্যবস্থা করিতেছি।

আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপত্তি জানাইতে গেলাম, কিন্তু মুখ দিয়া একটা কথাও ফুটিল না।

তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে গুহা হইতে দুইটি অঙ্গুরীয় আনিয়া আমার হাতে পরাইয়া দিয়া কহিলেন, বৎস, ভয় পাইও না—একটির সাহায্যে তুমি বর্ত্তমান যুগের যে কোন দ্রব্য সেই সুদূর অতীতকালেও টানিয়া নিয়া যাইতে পারিবে। আত্মরক্ষার জন্যই আমি এ ব্যবস্থা করিতেছি। আর একটি অঙ্গুরীয় সাহায্যে তুমি যখন খুসী আবার আমার কাছে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

তাহার পর ঋষিবর উদাত্ত-স্বরে কি এক মন্ত্র পাঠ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই লেলিহান অগ্নিশিখা হইতে রাশি রাশি ধোঁয়া বাহির হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আমি কি করিতেছি—কোথায় চলিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সাম্‌নের, পিছনের, ডাইনের, বামের যেন কত-কালের কৃষ্ণ-যবনিকা ভেদ করিয়া আমি উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিলাম।

তিন

যখন জ্ঞান হইল চাহিয়া দেখি, একটি তরুণ-তাপস ভৃঙ্গার হইতে আমার মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিতেছে।

কহিলাম, এ আমি কোথায় এসেছি?

তরুণ তাপস আমার কপালে তাহার স্নিগ্ধ হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, এইবার তোমার আর কোন ভয় নেই। আমি মহামতি ব্যাসদেবের শিষ্য।

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম, ব্যাসদেবের? তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কোত্থেকে এলাম?

তাপস কহিল, তুমি গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছিলে—আমি মধু আহরণের জন্যে গঙ্গার তীর দিয়ে বনের দিকে যাচ্ছিলুম, তোমায় দেখতে পেয়ে জল থেকে তুলে আনি। এই ত' তোমার জ্ঞান হ'ল।

হ্যাঁ, ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা সব কথা মনে পড়িল। বীরেশদের সঙ্গে ঋষিকেশের পথে যাইতেছিলাম, তারপর সেই ঋষিবর—সেই লেলিহান অগ্নিশিখা—তার উচ্চারিত মন্ত্র—আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

তাপস কহিল, আমার দেহের ওপর ভর দিয়ে আশ্রমে চল—সেইখানে আমাদের কাজলী গাইয়ের খানিকটা গরম দুধ খেলেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে।

ভাবিলাম ব্যাসদেবের কাছে আর যাইব না—ঋষিবর ফিরিয়া যাইবার জন্য যে আংটিটী দিয়াছিলেন তাহার কথা মনে হইতেই হাতের দিকে চাহিয়া দেখি কি আশ্চর্য্য—দ্বিতীয়টী আছে, কিন্তু ফিরিয়া যাইবার আংটিটী হাতে নাই।

নিশ্চয়ই গঙ্গার স্রোতের জলে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়! আজীবন আমাকে এই ব্যাসদেবের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে নাকি?

আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া হাঁস মনে করিল, হাঁটিয়া আশ্রমে যাইবার ক্ষমতা আমার নাই।

সে তাই আমাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়াই আশ্রমে রওনা হইল।

অচেনা লোক দেখিয়া আশ্রমে বেশ সোরগোল পড়িয়া গেল। চিড়িয়াখানায় অদ্ভুত জানোয়ার দেখিলে আমরা যেমন ভীড় করিয়া মজা দেখিতে যাই—আমার নতুন ধরণের সাজ-পোষাক ও চেহারা দেখিয়া দলে দলে আশ্রমের বালকেরা ঠিক তেমনি ছুটিয়া আসিয়া আমার চারিপাশে জড় হইল।

ঠিক এই সময় একটা কুটীরের মধ্য হইতে একটা বৃদ্ধ তাপস-মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার সাদা ধবধবে চুল আর দাড়ি দেখিয়া অনুমানে বুঝিলাম—ইনিই মহামতি ব্যাসদেব।

মনের ভিতর হইতে কে যেন কি শিখাইয়া দিল। অভিভূতের মত তাঁহার পায়ে পড়িয়া কহিলাম, প্রভু, আপনি

দয়া করে আমায় মর্ত্ত্যলোকে পাঠিয়ে দিন—আমি আর কিছুই চাইনে।

মৃদু হাসিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, সে ক্ষমতা আমার নেই। যে ঋষি যোগবলে তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন—একমাত্র তিনিই আবার তোমায় তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এবার সত্যই ভয় পাইয়া গেলাম। কহিলাম, প্রভু, কিন্তু আমি যে তার দেওয়া অঙ্গুরীয়ক হারিয়ে ফেলেছি!

ব্যাসদেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, আবার তোমাকে বর্ত্তমানে ফিরে যেতে হলে—ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে—অতীতের স্তর ভেদ করে অগ্রসর হতে হবে। তারপর একদিন চোখ মেলে চেয়ে দেখবে—সত্যিই তুমি আবার তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফিরে গেছ! অতীতের ঘূর্ণিপাক থেকে মুক্তি পাবার এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

ভারী দমিয়া গেলাম। এ আবার কি ফ্যাসাদ রে বাপু! কোথায় দল বাঁধিয়া গঙ্গার উৎপত্তিস্থান খুঁজিতে যাইব, না আসিয়া পড়িলাম—অতীতের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে।

কত কি ভাবিতে লাগিলাম! কিন্তু সহসা চমক ভাঙ্গিল সেই তাপস-বালকের ডাকে।

সে কহিল, ভাই, তুমি কোত্থেকে এলে তা ত' জানি না—গুরুদেব যে তোমায় কি বল্লেন, তাও বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি—ব্যাসদেব আর আশ্রম-বালকরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শুধু সেই তাপস-বালকটা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

কহিলাম, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, সামান্য কিছু খেতে দিতে পার?

তাপসটী ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে তাহার হাতের ভৃঙ্গারটা ভর্ত্তি করিয়া দুধ লইয়া আসিল। দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় এক চুমুকে সবটুকু খাইয়া ফেলিলাম।

কি চমৎকার স্বাদ! কলিকাতায় সকাল বেলা—ভীমা গয়লার দেওয়া বাটী বাটী দুধ খাইয়াও শরীর এতটুকু ভাল হয় না। কিন্তু এই দুধটুকু খাইয়াই মনে হইল, বুঝি এখন এক ঘুসিতে একটা পাহাড় চূর্ণ করিতে পারি। এখন বুঝিলাম, কি জন্য অতীত যুগের ঋষিরা এতদিন বাঁচিতেন।

মনে একটু স্বস্তি বোধ করিলাম। হঠাৎ শুনিলাম, আশ্রমের ভিতর হইতে বেদ-গান শোনা যাইতেছে।

তাপস-বালক কহিল, ভাই, আমি ত' আর অপেক্ষা করতে পারবো না, বেদ-গান সুরু হয়ে গেছে,—চল তুমিও আমাদের সঙ্গে গান করবে।

কি সর্ব্বনাশ! চক্ষু প্রায় কপালে গিয়া উঠিল। বেদের শুধু নামই শুনিয়াছি—কিন্তু এদের সঙ্গে যদি গিয়া গান গাহিতে হয়, তবেই গিয়াছি আর কি!

মনের ভাবটা গোপন করিয়া কহিলাম, না ভাই, তুমি

যাও—আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই কিনা—আমি গঙ্গার ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।

আচ্ছা সেই ভাল, বলিয়া তাপস তাড়াতাড়ি আশ্রমের ভিতর চলিয়া গেল।

আমি গঙ্গার দিকেই চলিয়া আসিলাম।

নদীর ধারে প্রকাণ্ড একটা পাথরের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আচ্ছা এই ত' গঙ্গা নদী—এই নদীই 'ত' হরিদ্বার হইয়া বরাবর কলিকাতা অবধি চলিয়া গিয়াছে—এই গঙ্গার ধার দিয়া বরাবর চলিয়া গেলে কি ঠিক জায়গা মত গিয়া পৌঁছিতে পারি না?

কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাসদেবের কথা মনে হইল এবং বুঝিতে পারিলাম—আমি অন্য যুগে চলিয়া আসিয়াছি—কাজেই গঙ্গা ধরিয়া চলিয়া গেলেই আমাদের হরিদ্বার আর কলিকাতা কোথায় পাইব?

হঠাৎ পায়ের কাছে ঝুপ্ করিয়া কি একটা পাখী আসিয়া বসিল। চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড এক রাজহাঁস। কিন্তু অবাক্ হইলাম তখনই—যখন শুনিলাম হাঁসটা মানুষের মত কথা কহিল।

বলিল, দেখ ভাই, আমি বড় বিপদে পড়েছি।

কহিলাম, বিপদ! তোমার আবার কিসের বিপদ?

ডানার ভিতর ঠোঁটটা একবার বুলাইয়া লইয়া হাঁস কহিল, আমার নাম লম্বগ্রীব, নিষধ নগরের নল রাজা আমাকে দিয়ে

এক চিঠি পাঠিয়েছিল—বিদর্ভরাজের মেয়ে দময়ন্তীর কাছে। কিন্তু ভাই কি বলব—বনের পথে যেতে যেতে পালকের ভিতর থেকে চিঠিখানা কোথায় হারিয়ে গেছে, এখন আমি দময়ন্তীর কাছে গিয়ে মুখ দেখাই কি করে বল ত' ?

বড় কৌতুক বোধ করিলাম। কহিলাম, হ্যা, চিঠি চুরি গেলে ত' বিপদেরই কথা। আচ্ছা, তুমি আমায় স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে ? তাহ'লে হয়তো চিঠিটার একটা ব্যবস্থা করতে পারবো !

হাঁস ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, ওমা ! ভাল লোকের পাল্লায় পড়েছি ! স্বর্গেই যদি যেতে পারবো ত' তোমায় খোসামোদ করতে এসেছি কেন ?

হঠাৎ মাথার উপর শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিয়া ভাবিলাম, এখানেও আবার এরোপ্লেন আসিল নাকি ? চাহিয়া দেখি ধব্ধবে সাদা দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা, বীণা হাতে এক বুড়ো ঢেঁকির উপর চড়িয়া শোঁ-শোঁ শব্দে উড়িয়া যাইতেছে !

হাঁসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও লোকটা কে বল ত' ? খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

হাস বিরক্ত হইয়া কহিল, ও বিট্‌লে বামনকে কে আর না চেনে ! নারদ গো—নারদ, ঝগড়া বাধাবার ওস্তাদ। কিন্তু বাজে কথা শোনবার ত আমার সময় নেই ! বলি চিঠি-খানা খুঁজে দিতে পারবে···না উঠবো ?

আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলাম, আহা অত

চট কেন ? তারপর তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিলাম, আচ্ছা নারদ ত' স্বর্গেই যাচ্ছে।

হাঁস জবাব দিল, বোধ হয়।

আমি উৎসাহিত হইয়া কহিলাম, আচ্ছা হাঁস ভাই, তুমি চুপি চুপি আমায় পিঠে করে নিয়ে ঐ ঢেঁকির পেছন দিক্‌টায় বসিয়ে দিতে পার ?

হাঁস খুব খুসী। বলিল, শীগ্‌গির।

পিঠে চাপিয়া বসিলাম। তারপর ঢেঁকির কাছে পৌঁছিতেই এক লাফে তার পেছনকার ডাণ্ডা ধরিয়া ফেলিলাম।

পেরালাল্‌ বার্‌ করার অভ্যাস ছিল, কোন রকমে ঝুলিতে ঝুলিতে স্বর্গের দিকে শোঁ-শোঁ শব্দে উড়িয়া চলিলাম।

চার

গঙ্গার উপরে দিব্যি ফুরফুরে বাতাস। নারদ মনের আনন্দে ঢেঁকিতে চাপিয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়াছিলেন।

আচম্‌কা ঢেঁকির পিছন দিকে ভার পড়িতে—তখুনি উল্টাইয়া গঙ্গার জলে পড়িয়া যাইতেছিলেন কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহ! কাছাটা আটকাইয়া গেল সামনের দিক্‌কার ডাণ্ডাটার সঙ্গে।

কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ঢেঁকির উপর ভাল করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পেছন দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাকার এক অর্ব্বাচীন বালক পেছন দিক্‌কার ডাণ্ডা ধরিয়া ঝুলিতেছে।

নারদের সুদীর্ঘ জীবনে এ ধরণের দুর্ঘটনা এই প্রথম। আকাশপথে চলিতে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য কেউ কোন দিনের তরে তাঁহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই—আজ কিনা সামান্য একটা বালক একেবারে তাঁহার বাহনের উপর চড়িয়া বসিয়াছে! আর একটু হইলে তাঁহাকেই গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিল আর কি! ত্রিভুবন যাঁহার একটি কথার ভয়ে কম্পিত—এক অজাতশ্মশ্রু বালক আজ তাঁহাকে এমন করিয়া অপদস্থ করিল! রাগে নারদের লম্বা দাড়ি চলমান মেঘের মত দুলিতে লাগিল।

তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন, ওরে ছোঁড়া, তোর কি মৎলব ?

আমি কহিলাম, প্রভু, আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়—স্বর্গে পৌঁছিলেই আপনার বাহন থেকে নেমে আমি আমার পথ আপনিই খুঁজে নেবো।

নারদ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, স্বর্গে পৌঁছিলে তোমার কি দশা হয় তাই দেখ। দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের কাছে তোমায় ধরিয়ে দিয়ে তোমার কি দুর্দ্দশা করি দেখ !

বুঝিলাম, তাঁহার সহিত কথা-কাটাকাটি করিয়া বিশেষ লাভ নাই, কুঁদুলে আজ সত্যিই চটিয়াছে।

মস্ত বড় একটা শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া চুপ্‌চাপ্‌ ঢেঁকির উপর বসিয়া রহিলাম।

আরও কিছুদূর যাইতেই নীচের দিকে চাহিয়া দেখি—প্রকাণ্ড এক নদী। এক পাট্‌নী ছোট একটা ডিঙি নৌকা করিয়া বহু যাত্রী পার করিয়া লইয়া যাইতেছে। নদীর যে প্রকাণ্ড ঢেউ—যদি কোন রকমে কুঁদুলে মুনির বাহনের উপর হইতে পা ফস্কাইয়া যায় ত' নিস্তারের কোন উপায়ই থাকিবে না। কোন রকমে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠাকুর, এ নদীর নাম কি ?

মুনি রাগিয়া কহিলেন, এই নদীটি পার হওয়ার ব্যবস্থাই তোমার করবো।

বুঝিলাম, রাগ এখনও যায় নাই। তবুও যথাসম্ভব

গলাটাকে মোলায়েম করিয়া কহিলাম, নামটা কি তাই শুনি না ঠাকুর।

মুখ ভার করিয়া নারদ জবাব দিলেন—বৈতরণী।

সত্যই আঁৎকাইয়া উঠিলাম। কি সর্ব্বনাশ—একেবারে বৈতরণী পার! যাহোক্‌, সাহস করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মুনি, স্বর্গ আর কতদূর?

মুনি এবার সত্যই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সেইখানে একবার পৌঁছুতে পারলেই ত' বাঁচি! এখনও মন্দাকিনী পেরুতে হবে—তারপর ইন্দ্রের পারিজাত-বন—তারপর ত' স্বর্গধাম! ততক্ষণ তোমার বক্‌বকানি সইতেই হবে!

ভারি হাসি পাইল। দেশে ফিরিয়া ক্লাশে গিয়া যদি গল্প করি যে নারদ মুনির সঙ্গে ঢেকিতে বসিয়া বক্‌বক্‌ করিয়া আসিয়াছি—তাহা হইলে বিশ্বাস ত' কেউ করিতেই চাহিবে না—উপরন্তু মাথায় চাঁটি বসাইয়া দিবে।

যাহোক্‌, আর কোন কথা বলিয়া মুনিকে ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না।

খানিক বাদেই নীচের দিকে চোখ পড়িতেই দেখি মন্দাকিনী, চোখ জুড়াইয়া গেল—এই চিরবসন্তের দেশ!

দলে দলে দেবতারা নানা ঘাটে স্নান করিতেছেন। কত অপ্সরী-কিন্নরী ও বিদ্যাধরীরা পূর্ণকুম্ভ লইয়া তীর ধরিয়া ঘরে চলিয়াছে।

মন্দাকিনী ছাড়াইয়া ঢেঁকি পারিজাত-বনের উপর দিয়া শোঁ-শোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

ভাবিলাম—এর পরেই ত' নারদ ঋষি সোজা দেব-সেনাপতির কাছে গিয়া হাজির হইবেন। তার চাইতে এক কাজ করা যাক্। এই পারিজাত-বনে নামিয়া থাকিলে মন্দ হয় না।

ঢেঁকিটা যেই একটি উঁচু গাছের কাছাকাছি হইয়াছে অম্‌নি ঝুপ্ করিয়া তাহার একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম।

নারদ মুনির বাহন আমাকে ফেলিয়া শোঁ-শো শব্দে স্বর্গের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভাবিলাম—এখন মনের আনন্দে পারিজাতের মধু খাওয়া যাক্! সবে গোটাকয়েক ফুল ছিঁড়িয়াছি—দেখি দলে দলে সব দেব-সেনা স্বর্গপুরী হইতে পারিজাত-বনের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রথমটা ভাবিলাম, আমি ফুল ছিঁড়িয়াছি তাই দেখিতে পাইয়া বাগান-রক্ষকরা ছুটিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এ তো তা' নয়—দলে দলে সব সৈন্যেরা মুহূর্ত্ত-মধ্যে পারিজাত-বন একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

তারপর একটা শব্দ শুনিতেই আকাশে চাহিয়া দেখি ঢেঁকিবাহনও এইদিকে ধাওয়া করিয়াছে।

পলকের ভিতর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম।

নিশ্চয়ই কুঁদুলে ঠাকুর গিয়া দেব-সেনাপতিকে খবর দিয়াছে—তাহারই ফলে এই রণ-সজ্জা।

কিন্তু বাঁচিবার উপায় !

টুক-টুক করিয়া গাছ হইতে নামিয়া একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিলাম।

সৈন্যেরা বাগানে ঢুকিয়া আঁতি-পাতি করিয়া আমায় খুঁজিতে সুরু করিল।

খানিক বাদেই আর একটি সৈনিক আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড ! এ যে আমাদের গোবিন্দ ! বছর খানেক হইল মারা গিয়াছিল।

ঝোপের ফাক দিয়া হাত বাড়াইয়া উত্তরীয় ধরিয়া এক টান মারিয়া চাপা গলায় ডাকিলাম—গোবিন্দ !

গোবিন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর ঝোপের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, রনু তুই !

আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, চুপ্ ! কিন্তু তুই এখানে কেমন করে এলি, আবার সৈনিক হলিই বা কি করে ?

গোবিন্দ কহিল, মৃত্যুর পরই যমদূত আমায় যমপুরে নিয়ে আসে। সেখানে দু'মাস থাকবার পর ইন্দ্রদেবের দেহরক্ষী হয়ে আছি। কিন্তু তুই ?

আমি তাহাকে সংক্ষেপে সব কথা খুলিয়া বলিয়া কহিলাম, ভাই, আমায় কোনমতে ইন্দ্রদেবের বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। সেইখানেই বোধ করি নলের চিঠির খোঁজ মিলবে।

গোবিন্দ আমায় ধমক দিয়া কহিল, আরে বোস্, আগে ত' তোর প্রাণ বাঁচাই, তারপর দময়ন্তীর চিঠি! সে পরে

গোবিন্দ আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "রনু তুই!"

হবে'খন।—আর দেখ্, খবরদার, আমায় কখনও গোবিন্দ বলে ডাকিস নি—এখানে আমার নাম বলবন্ত সিং।

কহিলাম, বলবন্ত—বলবন্তই সই—প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি তোকে সব নামে ডাকতেই রাজী আছি।

গোবিন্দ কহিল, চুপ্। নারদ মুনি ঢেঁকি থেকে নেমে এইদিক পানেই আস্‌ছে।

চট্ করিয়া আবার ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম।

নারদ হন্‌হন্ করিয়া আবার অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ অমনি গায়ের উত্তরীয়খানি খুলিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, এইটে দিয়ে গা জড়িয়ে নে রনু। তারপর আমার পেছন পেছন আয়—

ইস্কুলে চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় নাম করিয়াছিলাম। গাছের আড়ালে গিয়া এক মুহূর্তের মধ্যে দেব-সেনানীর বেশ ধারণ করিলাম। তারপর গোরা সৈন্যের কায়দায় বাহিরে আসিয়া কহিলাম, quick march বলবন্ত সিং—

গোবিন্দ কহিল, চুপ্—এ তোমার হেয়ার ইস্কুল নয়। সুবোধ বালকের মত আমার সঙ্গে এসো।

পাঁচ

গোবিন্দের সঙ্গে ইন্দ্রপুরীর সাম্‌নে আসিয়া একেবারে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলাম।

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও দেখিয়াছি, আর একবার আগ্রা বেড়াইতে গিয়া তাজমহলও দেখা হইয়াছে—কিন্তু ইহাকে যে কাহার সহিত তুলনা করিব—ভাবিয়া পাইলাম না। ইন্দ্রপুরী তো ইন্দ্রপুরী—হ্যাঁ—খাসা কারিকর এই বিশ্বকর্ম্মা!

ইন্দ্রপুরীর ভিতরে বাঁ'-হাতি একটা কামরায় গোবিন্দের থাকিবার আস্তানা। সে কহিল, বোস্ রনু, তোর জন্যে পারিজাতের মধুর মিষ্টি সরবৎ নিয়ে আস্‌ছি।

কহিলাম, আমি যে এখানে বসে বসে খুব আরামে সরবৎ খাবো—তা হবার যো নেই—এক্ষুণি আমায় ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। দময়ন্তীর সেই চিঠিখানার একটা খোঁজ করতে হবে ত'।

গোবিন্দ কহিল, কিন্তু তার আগে ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।—অপরিচিতের জন্যে এই ব্যবস্থা। তুই ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নে, আমি ফিরে এলাম বলে।

গোবিন্দ চলিয়া গেলে ভাবিলাম—ইন্দ্রদেবের সঙ্গে দেখা করিয়া যদি অনুমতি চাইতে হয়—তবে গিয়াছি আর কি!

কোন রকমে ঝুলিতে ঝুলিতে স্বর্গের দিকে শ শা শব্দে উড়িয়া চলিলাম।

১৪ পৃষ্ঠ

কেন দেখা করিতে চাই জানিবার জন্য হয়ত এক্ষুণি তলব আসিবে। আর গিয়া দেখিব—কুঁদুলে ঠাকুর বসিয়া সেখানে তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিতেছেন। দরকার নাই অনুমতি চাহিয়া, কপালে যাহা হয় হইবে—এক পা' দুই পা' করিয়া মহলের দিকে পা' চালাইয়া দিলাম।

কিছুদূর যাইতেই বুঝিলাম—ডান দিক্‌কার একটা কক্ষের ভিতর হইতে চমৎকার আতরের মত গন্ধ বাহির হইতেছে। পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা পর্য্যন্ত গিয়া পরদার ফাঁক দিয়া চাইতেই বুঝিলাম, দশজন দাসী মিলিয়া যাঁহার মাথায় তেল মাখাইয়া দিতেছে, ইনিই ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কেউ নন।

মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি আসিল—একেবারে ছুটিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর পা' জড়াইয়া কহিলাম, মা, তোমার সঙ্গে আমার একটা বড় জরুরী কথা আছে।

হঠাৎ অচেনা একটা ছেলেকে অমনি করিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, কে বাবা, তুমি আমায় মা বলে ডাকলে ?

আমি সুযোগ বুঝিয়া কহিলাম,—মা, তোমার কাছে চুপি চুপি একটা কথা বলবার আছে—আর কেউ থাকলে ত' তা বলতে পারব না !

তিনি আমার কথা শুনিয়া দাসীদের কক্ষ ছাড়িয়া যাইতে

ইসারা করিলেন—তারপর আমার কাছে আসিয়া কহিলেন, এইবার তুমি কি বলবে বল!

ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা কি ভাবে দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার মতলব করিয়া রাজহংসের কাছ হইতে কি ভাবে চিঠি চুরি করিয়া নিয়াছেন, সেই কাহিনী ইন্দ্রাণীকে জানাইয়া কহিলাম,—আমার মনে হয়,—ইন্দ্রদেবের কাছে চিঠিখানা পাওয়া যাবে। আপনি যদি একটু কষ্ট করে তাঁর পুঁথিপত্র খুঁজে দেখতেন—

ইন্দ্রের আবার বিবাহ করিবার সখ হইয়াছে জানিতে পারিয়াই ইন্দ্রাণী ঠাকরুণ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, তুমি বড় ভাল ছেলে, আর কারও কাছে না গিয়ে তুমি যে সকলের আগে আমাকে খবর দিতে ছুটে এয়েছ, এজন্য আমি ভারী খুসী হয়েছি।

তারপর তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তিনি কহিলেন, তুমি একটু বসো বাবা, আমি খুঁজে দেখ্‌ছি, চিঠি কোথায়। ও জঞ্জাল আমি তোমার সঙ্গেই বিদায় করে দেবো। তুমি সেই রাজহংসকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো, বুঝলে?

এত সহজে কাজ উদ্ধার হইবে ভাবিতে পারি নাই। বসিয়া আপন মনে বুদ্ধির তারিফ করিতেছি—এমন সময় ইন্দ্রাণী আসিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলেন। কহিলেন, খুঁজে বের করেছি বাবা—ইন্দ্রদেবের পেটে পেটে যে এত

বুদ্ধি, তা ত' আগে বুঝতে পারিনি। দিব্বি একটা পারিজাতের মালার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি করে ?

উঃ, ফিরে এসে কি জব্দটাই না হবে। আমার হাতে পদ্মপত্রে লেখা একটি চিঠি গুঁজিয়া দিয়া ইন্দ্রাণী আপন মনে খুব হাসিতে লাগিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া কহিলাম, তবে আমি যাই মা, দেরী হলে হয়ত আর সে রাজহংসকে খুঁজে পাবো না—

ইন্দ্রাণী হাসি থামাইয়া কহিলেন, পাগল, তাও কি হয়—তোমায় মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি এমনি ছেড়ে দিতে পারি ? তুমি আর একটু বোসো বাবা—আমি এই এলুম বলে !

খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া হাতে এক সোনার রেকাবী ভর্ত্তি নানারকম মিষ্টি খাবার দিয়া কহিলেন, সব আমার নিজের হাতের তৈরী, এর একটাও ফেলতে পারবে না বাবা !

একে স্বর্গের মিষ্টি,—তাও আবার ইন্দ্রাণী দেবীর নিজের হাতের তৈরী ! গন্ধেই মুখ লালায় ভর্ত্তি হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া সবে একটা মুখে দিতে যাইব—চোখ তুলিয়াই সামনে যাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম—তিনি স্বয়ং ইন্দ্রদেব ছাড়া আর কেউ নন। কারণ তাঁর পেছনে দাঁড়াইয়া সেই কুঁদুলে ঠাকুর আঙ্গুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া কহিলেন,

দুইজনে ভারী ভাব হইয়া গেল।

ধনুকেশ্বর কহিল, চল বন্ধু, তোমায় আমার আর এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আজ তার ছেলের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছে! ভারী বনিয়াদী বংশের লোক ওরা! সরস্বতী দেবীর বাহন—চিত্রগ্রীব।

কহিলাম, চল বন্ধু, তা'হলে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়াই পথ। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়া অনেকটা যাওয়ার পরই—চমৎকার এক দীঘির পারে আসিয়া পৌঁছিলাম। গোটা দীঘিটা শ্বেতপদ্মে ভর্ত্তি।

ধনুকেশ্বর পৌঁছিতেই একটি রাজহাঁস ছুটিয়া আসিয়া কহিল, বন্ধু, তোমার আস্‌তে যে এত দেরী! নিমন্ত্রিতেরা সব খেতে বসে গেছে।

ধনুকেশ্বর কহিল, আমার এই বন্ধুকে নিয়ে আসতে এত দেরী হয়ে গেল। তারপর সে সকলের সঙ্গে আমায় আলাপ করাইয়া দিল। সে এক অপূর্ব্ব ভোজ-সভা! মহাদেবের বাহন ষাঁড় হইতে সুরু করিয়া দুর্গার বাহন সিংহ, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, যমের বাহন মহিষ—এমনি দেবতাদের প্রত্যেকটি বাহন পাশাপাশি বসিয়া মহা আনন্দে নিমন্ত্রণ খাইতেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলে বর ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। চিত্রগ্রীব কহিল, ভাই, তুমি একটু বসে যাও, তোমার বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ করি।

আমি কহিলাম, আমার ত' বসবার উপায় নেই—লম্বগ্রীব রাজহাঁস—আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

লম্বগ্রীব নাম শুনিয়াই চিত্রগ্রীব কহিল, তাকে আপনি কি করে চিনলেন —সে-যে আমার বড় ভাই—

আমি সব কথা খুলিয়া বলিয়া কহিলাম, ভাই, এখন আমার এই চিঠি নিয়ে তার কাছে না গেলেই নয়—

চিত্রগ্রীব কহিল, তার জন্য আর চিন্তা কি? আমি পিঠে করে আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব'খন।

খানিক বাদেই চিত্রগ্রীবের পিঠে চড়িয়া আবার মর্ত্ত্যে রওনা হইলাম। প্রায় বৈতরণীর কাছে আসিয়াছি—এমন সময় পেছনে একটা শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি—নারদ আবার ঢেঁকিতে চাপিয়া আমাদের পেছু নিয়াছে।

বুঝিলাম, এইবার আর রক্ষা নাই! যেমনি ভয়ে ভয়ে চিত্রগ্রীবের গলা আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াছি, একেবারে তাহার পিঠ হইতে ফস্‌কাইয়া হুস্ হুস্ শব্দে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ডিগবাজী খাইয়া নীচের দিকে পড়িতে লাগিলাম।

ছয়

ঘুরপাক খাইতে খাইতে কোন্ অতল-জলে গিয়া যে পড়িতাম, তা' একমাত্র আমার অদৃষ্টদেবতাই জানিতে পারেন —কিন্তু হঠাৎ শূন্যপথে দুই দিক হইতে দুইটি শক্ত হাত আমাকে একেবারে ধরিয়া ফেলিল! কহিল, কি ভায়া, স্বর্গ থেকে আস্‌ছ।—তুমি বুঝি আমাদের চাইতেও বেশী করে সোমরস খেয়েছ?

মাথাটা ভয়ানক ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল—তাদের দুইজনের দুই কাঁধে ভর দিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। তারপর কহিলাম, শূন্যপথে উড়ে যাচ্ছ, তোমরা আবার কে?

প্রথমজন কহিল, আমাদের চেন না? আমরা হচ্চি, হা-হা আর হুঁ-হুঁ। দুই গন্ধর্ব্ব। আমরা শুধু সোমরস পান করি, গান গাই আর মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। চল না আমাদের সঙ্গে—

পেছন ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম—নারদের ঢেঁকি তখনও পেছু পেছু আসিতেছে কিনা—

নাঃ—কুঁদুলে ঠাকুরের আর টিকিটীও দেখা যাইতেছে না। কহিলাম, তা, কোথায় যাচ্ছ তোমরা আগে শুনি—

হুঁ-হুঁ ভয়ানক জোরে আবার হাসিতে লাগিল। হা-হা আমাকে কাতুকুতু দিয়া কহিল, ত্রিভুবন আজ ছুটে চলেছে সেই

দিকে, আর তুমি জিজ্ঞেস কচ্ছ কোথায় যাচ্ছি? বলি, তুমি কোন্ দেশের লোক?

গম্ভীর হইয়া কহিলাম, আমার বাড়ী কল্‌কাতায়।

একজন কহিল, কল্‌কাতা? সে আবার কোথায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াই কিন্তু এমন উদ্ভট নাম কোথায়ও শুনিনি ত'! অলকানন্দার উত্তর পাড়ে হবে বুঝি?

হা-হা কহিল, তা যেখানেই হোক্ না কেন—আমাদের সঙ্গে চল,—পেট পুরে খেতে পারবে—প্রাণ খুলে আমোদ করতে পারবে।

কহিলাম, কোথায় তোমরা যাচ্ছ তাই আগে শুনি না?—

হা-হা কহিল, তুমি কিছুই জান না দেখ্‌ছি। তবে ব্যাপারটা খুলে বলি। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্যে ময়দানব চমৎকার এক সভাগৃহ তৈরী করেছে। সেইখানে রাজসূয় যজ্ঞ হবে! গোটা পৃথিবীর লোক সেই সভা দেখ্‌তে যাচ্ছে—আর তুমি যাবে না?

বুঝিলাম, অতীতকালের ঘূর্ণিপাকে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি—যাইতেছিলাম দময়ন্তীর কাছে—চলিলাম, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখ্‌তে!

কহিলাম, বেশ ত'! সে ত' ভাল কথাই!—তা' আগে বলতে হয়!

হা-হা—হুঁ-হুঁর সঙ্গে তিন দিন তিন রাত্রি আকাশপথে উড়িয়া চারিদিনের দিন আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে হাজির হইলাম।

কোন রকমে ত' গন্ধর্ব্বদের সঙ্গে জমিতে নামা গেল, কিন্তু পুরীতে ঢোকা নিয়াই এক মহামারী ব্যাপার! স্বয়ং ভীম আসিয়া অনুমতি না দিলে নাকি কেহ পুরীতে ঢুকিতে পারে না!

খবর পাওয়া গেল সাত দিনের মধ্যে কোনমতেই ভিতরে যাওয়ার হুকুম পাওয়া যাইবে না।

হা-হা, হুঁ-হুঁ দুই গন্ধর্ব্ব। অমরলোকের জীব—ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন বালাই নাই। কিন্তু আমি? আমার চলে কি করিয়া? আর সব করিতে পারি, কিন্তু না খাইয়া কোন-মতেই থাকা চলে না।

যে করিয়াই হোক্ পুরীতে ঢুকিতেই হইবে। তারপর খোঁজ করিতে করিতে দ্রৌপদী ঠাক্‌রুণের রান্নাঘর বাহির করিতে কতক্ষণ?

হঠাৎ সোরগোল শোনা গেল—যুধিষ্ঠিরের মামা শল্যরাজ আসিয়াছেন। তাঁহার হাতী শুধু এখন ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

চুপচাপ রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম—যে করিয়াই হোক্ ইহার সঙ্গে যদি ভিতরে ঢুকিতে না পারি ত' মহা বিপদেই পড়িতে হইবে। প্রকাণ্ড এক হাতী, তারই উপর শল্যরাজের সিংহাসন। যেই হাতীটি সদর দরজার কাছে আসিল অমনি চট্ করিয়া হাতীর পেটের তলায় গিয়া নীচেকার একটি দড়ি ধরিয়া একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া

রহিলাম। বাহির হইতে কে একটা লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, হাতীর পেটের তলায় কে রে?

কিন্তু হাতী ততক্ষণে ফটকের ভিতর দিয়া পুরীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তখন আর আমাকে পায় কে? এক লাফে নীচে পড়িয়া ভিতরের দিকে দে ছুট্! তারপর নানা জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম কোথায় দ্রৌপদীর বাসভবন।

কিন্তু তোরণ-দ্বারের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া আর কারও সেখানে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

এ যে বড় বিপদেরই কথা হইল।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় আসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ওখান হইতে সরিয়া দক্ষিণ দরজার সামনে গিয়া বিশেষ ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া কহিলাম—মহারাজ ভীমসেনের কাছ থেকে আস্‌ছি। রাণী দ্রৌপদীর কাছে জরুরী কাজ আছে।

অভিনয় করিলাম চমৎকার! দ্বারী আমার মুখের ভাব দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে যাইবার রাস্তা করিয়া দিল।

আশে-পাশে না তাকাইয়া সোজা গিয়া অন্দর মহলে ঢুকিলাম। খানিক দূর যাইতেই দেখি, দাস-দাসী-পরিবৃতা—রাণী দ্রৌপদী নিজের হাতে পঞ্চপাণ্ডবের জন্য খাদ্যসামগ্রী থালায় সাজাইতেছেন।

আমি ছুটিয়া গিয়া কহিলাম, রাণী-মা, মহারাজ ভীমসেন বড়

ক্ষুধার্ত্ত—আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছ থেকে খাবার নিয়ে যেতে।

রাণী তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাতে একখানি থালা তুলিয়া দিলেন।

মহানন্দে থালা লইয়া প্রকোষ্ঠের পিছনে গিয়া রাজভোগ খাইতে স্থুরু করিয়া দিলাম।

হঠাৎ শুনিলাম—কক্ষের মধ্যে ভারী গলায় কে রাণীকে বলিতেছে,—কৃষ্ণা, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, শীগ্‌গির কিছু খেতে দাও—

তার উত্তরে—রাণী অবাক্‌ হইয়া যে কি বলিলেন—ঠিক শোনা গেল না! কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভারী গলায় প্রতিহারীকে কে কি আদেশ করিল—ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই দেখি, ভীষণ-দর্শন যমাকৃতি এক দ্বারী আমার পথ রোধ করিয়া কহিল, তুমি আমার বন্দী।

তখনও থালার মিষ্টি শেষ হয় নাই। প্রতিহারী শক্ত হাতে আমায় লইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "কাল তোমার বিচার হবে।"

সাত

সমস্তটা রাত ভয়ে ভয়েই কাটিল। এ নারদ মুনি নয়—যে ফাঁকি দিয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইব।

ভীমসেনের হাতে পড়িলে যে দ্বিতীয় কীচক-বধ-পালা সাঙ্গ হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমি কারাকক্ষের মধ্যে পাগলের মত ক্রমাগত পাইচারী করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ হাতের আংটির দিকে নজর গেল!

সেই হরিদ্বারের ঋষির কথা মনে পড়িল। দুইটি আংটি তিনি আমার হাতে পরাইয়া দিয়াছিলেন। একটির সাহায্যে আমি যে কোন সময় ঋষিবরের কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিব, আর একটি দিয়া আমাদের বর্ত্তমান কালের যে কোন জিনিষ সুদূর অতীতকালে টানিয়া আনিবার ক্ষমতা আমার থাকিবে।

প্রথমটি ব্যাসদেবের আশ্রমের কাছে গঙ্গার জলে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয় আংটিটা ত' এখনও আমার হাতে আছে। উহা দিয়াই ত' আমি এই যজ্ঞ পণ্ড করিতে পারি!

উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার সুরু করিয়া দিলাম।

চ্যাঁচামেচি শুনিয়া কারারক্ষী আসিয়া কহিল, বাপু হে, বেশী যদি চ্যাঁচাও ত' এক্ষুণি সোজা ভীমসেনের কাছে ধরে নিয়ে

যাবো। তখন বুঝতে পারবে—কি করে শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাক্‌তে হয়।

তাহাকে ধমক দিয়া কহিলাম, আরে ব্যাটা থাম্‌। এক্ষুণি তোদের কি দশা করি তাই দেখ্‌—

আমার মুখে গরম গরম কথা শুনিয়া কারারক্ষী আমাকে মারিতে ছুটিয়া আসিল।

আমি মনে মনে ভাবিলাম—একটা হাতী আসিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে কারাগারের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিক্‌!

অবাক্‌ কাণ্ড! যাহা ভাবিলাম তাই! ভৌতিক কাণ্ডের মত কোথা হইতে সত্য সত্যই এক জংলা হাতী আসিয়া চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে কারাকক্ষের লোহার দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যেন একেবারে আকাশে মিশিয়া গেল।

ব্যাপার দেখিয়া কারারক্ষীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পঞ্চপাণ্ডবকে সংবাদ দিতে ছুটিল!

আমি ততক্ষণে কারাগার হইতে বাহির হইয়া পুরীর বাহিরে হা-হা, হুঁ-হুঁর সহিত মিলিত হইলাম।

তাহারা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া কহিল, কি সর্ব্বনাশ, পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে বিবাদ—? যাও—এক্ষুণি গিয়ে তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে সমস্ত মিটমাট্‌ করে ফেল। কেন মিছিমিছি প্রাণটা খোয়াবে বল?

আমি হাসিয়া কহিলাম, দেখ, তোমাদের সৎ পরামর্শ

আমি শুন্‌ব। কিন্তু ভাই হা-হা, তোমাকে এক্ষুণি আমার দূত হয়ে পাণ্ডব-শিবিরে গিয়ে বলে আস্‌তে হবে, কেন ভীম-সেনের অনুচর আমায় বন্দী করেছিল—আমি তার কৈফিয়ৎ চাই—

আমার কথা শুনিয়া হা-হা হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। তারপর কহিল, নিশ্চয়ই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভাই হুঁ-হুঁ, রাজসূয় যজ্ঞে বোধ করি অশ্বিনীকুমারও এয়েছেন, তুমি ভাই তাঁকে এক্ষুণি খবর দাও।

আমি তাহার কথায় কাণ না দিয়া কহিলাম, অবশ্য আমার দূত হয়ে যখন যাচ্ছ—তার উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা আমি করবো। এই বলিয়া মনে মনে একটি 'বেবি অষ্টিনের' নাম করিতেই তক্ষুণি তাহা আমাদের সম্মুখে হাজির হইল।

আমি হা-হাকে আঙুল দিয়া সেইটে দেখাইয়া কহিলাম, আমার দূতস্বরূপে এই গাড়ীতে চড়ে তুমি পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে এই বার্ত্তা জ্ঞাপন কর। ভয় নেই, দূত অবধ্য।

মোটর দেখিয়া হা-হা, হুঁ-হুঁর প্রথমটা চোখ কপালের উপর উঠিল। রাঘব-বোয়ালের মত হাঁ করিয়া, তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, হ্যাঁ, বুঝ্‌লুম তুমি কেষ্ট-বিষ্টু কেউ একটা হবে, ছদ্মবেশে এসে আমাদের ছলনা কচ্ছ—তা যেই হও—তোমায় গড় করি ঠাকুর!

এই বলিয়া দুইজনে সাষ্টাঙ্গে আমায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হা-হা একলাফে গাড়ীতে উঠিয়া কহিল, হ্যাঁ, এইবার তোমার দূত হ'তে আমি খুব রাজী। কিন্তু পাণ্ডবরা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কার দূত—তাহ'লে কি জবাব দেবো?

তাইত! কি বলা যায়! এক লহমা ভাবিয়া লইলাম, তারপর চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—"বোলো, কলিকাতা-ধামের রঘুরাজ—"

ড্রাইভারকে আদেশ দিতেই সে হু-হু শব্দে গাড়ী চালাইয়া দিল।

হুঁ-হুঁ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া আমার কাণ্ড দেখিতেছিল। এইবার আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমি কে দেবতা?

মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, বল্লুমই ত' কলিকাতাধামের রঘুরাজ! আর হুঁ-হুঁ, তুমি হবে আমার মন্ত্রী। হা-হা ফিরে এলেই তাকে করবো সেনাপতি।

খানিক বাদেই হা-হা ফিরিয়া আসিল। ঠিক যেমন উৎসাহ লইয়া সে গিয়াছিল—বোধ করি তাহার চাইতেও বেশী পরিমাণে মুখ ভার করিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

তারপর ধপ্ করিয়া আমাদের সাম্‌নে বসিয়া পড়িয়া কহিল, ভাললোকের বুদ্ধিমত দূত হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ দূতকে কেউ প্রাণে মারে না, নইলে আজ যে আমার দশা কি হ'ত—তা একমাত্র ভগবানই জানেন। সহদেব ছুটে এসে আমায় কি অপমানটাই না করলে!

শুধু ধর্ম্মরাজের কৃপায় প্রাণ নিয়ে ফিরে এলুম। ভীম আর অর্জ্জুন সৈন্যদের হুকুম দিয়েছেন, যেখান থেকে পার সেই উদ্ধত রসুরাজকে ধরে এনে আমাদের সাম্‌নে হাজির কর।

হঠাৎ শিবিরের বাহিরে একটা কোলাহল শুনিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি—বহু পাণ্ডব-সৈন্য আমাদের চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শব্দ শুনিয়া হুঁ-হুঁও সাম্‌নে আসিয়াছিল; তারপর ব্যাপার দেখিয়া দু'জনেই হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পাণ্ডব-সৈন্যগণ আসিয়া একেবারে আমাদের শিবির দখল করিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন পালাইবার আর কোন পথই নাই!

মনে মনে চিন্তা করিবামাত্র একখানি এরোপ্লেন আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল—হা-হা আর হুঁ-হুঁকে টানিয়া লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশপথে হুস্‌-হুস্‌ শব্দে উড়িলাম।

পাণ্ডব-সৈন্যগণ অবাক্‌ হইয়া উপর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এক মুহূর্ত্ত হতভম্ব থাকিয়া পরক্ষণেই তাহারা বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া ফেলিল।

মনে মনে চিন্তা করিবামাত্রই পাণ্ডবদের সৈন্যগণের উপর দুইটি বোমা গিয়া পড়িল। তাহাতে বহু লোক হত হইল।

সংবাদ পাইবামাত্র ভীমার্জ্জুন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তারপর চলিল তুমুল সংগ্রাম।

অর্জ্জুন যত বাণ মারেন আমরা পাশ কাটিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে উড়িয়া বেড়াই—আর সুযোগ মত যেখানে সেখানে বোমা ফেলিয়া হাজার হাজার সৈন্য নাশ করি। চারিদিকে মুনিঋষিদের আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, ভাই, শুভ কাজ করতে বসে, এরকম লোকক্ষয় আর দেখ্‌তে পারি নে—তা' ছাড়া মুনিঋষিদের যদি জীবন নাশ হয় তবে নরকেও আমাদের স্থান হবে না। তোমরা রসুরাজকে ডেকে এনে সন্ধির প্রস্তাব কর।

স্বয়ং নকুল পাণ্ডবদের দূত-স্বরূপ আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। আমরা এরোপ্লেন হইতে নামিলাম। আমার মন্ত্রী হুঁ-হুঁ অগ্রসর হইয়া কহিল, সন্ধি করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আমাদের রসুরাজকে যে অকারণে বন্দী করে রাখা হয়েছিল—সেজন্য ভীমসেন এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই এ যুদ্ধের অবসান হ'বে।

অগত্যা তাহাই হইল। ভীম আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভাই, তোমার কাছে আমার একটা

অনুরোধ আছে! আমার এ পরাজয়ের কাহিনী যাতে আর কেউ না জান্‌তে পারে তোমায় তার ব্যবস্থা করতে হবে—নইলে আমি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারবো না।

আমি কহিলাম, ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—মহাভারতে এ কাহিনী স্থান পাবে না।

আট

সেদিন সকালবেলা শিবির হইতে বাহির হইয়া একটু বেড়াইতে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় হঠাৎ প্রায় সাড়ে ছয় হাত লম্বা এক সৈনিক আসিয়া হুম্‌কি দিয়া কহিল, তুমি কার আদেশে আমাদের রাজার রাজ্যে শিবির স্থাপন করেছ?

চোখ পাকাইয়া কহিলাম, বাপু হে—তোমাদের পঞ্চ-পাণ্ডবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর—সকালবেলা মিছিমিছি বিরক্ত কোরো না—

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড—আমার কথা শুনিয়া লোকটা এতটুকু দমিলও না, বরং আরো রাগিয়া উঠিয়া কহিল, কে তোমার পঞ্চপাণ্ডব জানি না, আমাদের রাজার কাছে তোমায় যেতে হবে।

ভারী হাসি পাইল। পঞ্চপাণ্ডব, কে চেনে না! আবার তাদের রাজার কাছে যাইতে হইবে! রাতারাতি আবার আর একজন রঘুরাজ আসিয়া হাজির হইল নাকি!

ভারী মজা লাগিল। কহিলাম, কে তোমাদের রাজা?

সৈনিক খাপ হইতে তরোয়াল বাহির করিয়া কপালে একবার ঠেকাইয়া কহিল, আমাদের রাজা—বিক্রমাদিত্য।

এবার সত্যি অবাক্ হইলাম। ছিলাম পাণ্ডবদের কাছে—

এক রাত্রির মধ্যে একেবারে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে আসিয়া হাজির হইয়াছি।

কহিলাম, কোন্ বিক্রমাদিত্য ?—বত্রিশ সিংহাসন যার ?

লোকটা হুম্‌কি দিয়া কহিল, হাঁ-হাঁ জান দেখ্‌ছি সবই—তবে বোকার মত ভান করে থাক কেন ?

হাসিয়া কহিলাম, জানিনা কিছুই। ভাগ্যিস্ ছেলেবেলা ইতিহাসটা পড়া ছিল—তাই এক কথায়ই ঠাহর করে নিতে পেরেছি।

সৈনিক কহিল, এ-সব কিছু বুঝিনে—চল রাজার কাছে—

কহিলাম, আচ্ছা, চল। তোমাদের রাজার সঙ্গেই একবার আলাপ করে আসা যাক্।

দুইজনে রাজপুরীর দিকে রওনা হইলাম।

আমরা যখন গিয়া হাজির হইলাম—রাজসভা তখন লোক-জনে গম্-গম্ করিতেছে।

খানিক বাদে আমার ডাক পড়িল। রাজা বিক্রমাদিত্য আমার দিকে চোখ ফিরাইয়া কহিলেন, কে তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে রাজ্যের ভেতর শিবির স্থাপন করেছ ?

বুক ফুলাইয়া ড্রিলের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি কল্‌কাতাধামের রন্টুরাজ—

রাজা অবাক্ হইয়া মন্ত্রীর দিকে তাকাইলেন।

মন্ত্রী আদেশ করিলেন—'রাজস্ব-খাতা'।

সাতটা জোয়ান লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা প্রকাণ্ড

খাতা লইয়া রাজসভায় হাজির হইল। মন্ত্রী মইয়ে চড়িয়া সেই খাতায় উঠিয়া কি হিসাবনিকাশ দেখিয়া আসিয়া কহিলেন,

"হাঁ-হাঁ জান দেখ্‌ছি সবই—তবে বোকার মত ভান করে থাক কেন ?"

সম্রাট্, কল্‌কাতাধাম বলে পৃথিবীতে কোন রাজ্য নেই। রনুরাজ বলেও কোন রাজার নাম এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।

রাজা রক্ষীর দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, লোকটাকে বল এক্ষুণি শিবির তুলে নিয়ে যেতে—

আমি কহিলাম, কখনই আমি আমার শিবির তুলব না—

সেনাপতি হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া কহিলেন, বটে? সে তরবারি লইয়া আস্ফালন করিয়া আমার মাথা কাটিতে ছুটিয়া আসিল।

মুনিবরের আংটীর সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে হাতের মুঠার মধ্যে একটা রিভলবার জুটাইতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হইল, তারপর সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল—সেনাপতি রাজসভার মাঝখানে মরিয়া পড়িয়া আছে!

এরকম ঘটনা—রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে এই প্রথম।

সভাশুদ্ধ লোক দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মন্ত্রী যে কোন্ দিকে ছুটিয়া পালাইবেন—সেই পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী কোন দেবতা! দেব, আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান না করে আমি মহা অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

এই বলিয়া যোড়হস্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, প্রভু! আমার নব-রত্ন সভা ভুবনবিখ্যাত, আজ

আপনাকে নিয়ে আমার সভা দশটি উজ্জ্বল রত্ন লাভ করে গৌরবান্বিত হোক্, সে অনুমতি দিন।

আমি হাসিমুখে জবাব দিলাম, মহারাজ, আমি আপনার রাজসভায় থেকে সব অসাধ্য সাধন করবো। কিন্তু ইতিহাসে আমার নাম দশম-রত্ন হিসেবে স্থান পাবে ত?

রাজা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

যাহা হউক দশম-রত্ন হিসেবে আমি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় স্থান পাইলাম। সকলেই শুনিল—যে কাজ দুনিয়ায় কেউ করিতে পারিবে না, আমি তাহাই সাধন করিব।

কিছুদিন বেশ আরামেই কাটিল। কিন্তু প্রত্যহই রাজার নব-রত্ন নানান্ রকম বিদ্যার বহর দেখাইয়া বাহবা নেয়। আমিই শুধু বোকার মত মাথা নাড়িয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সেই বাহবায় সাড়া দেই।

কালিদাস রাজাকে নতুন নতুন কবিতা শোনান, বরাহমিহির অদ্ভুত অদ্ভুত গণনা করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দেন। এমনি প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিদ্যার নব নব কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

কেহ কেহ আবার চুপি চুপি রাজার কাণে কাণে গিয়া লাগায়, মহারাজ, আপনার দশম-রত্ন কোন গুণেরই অধিকারী নয়। উহাকে রাখিয়া আপনি সভার অপমান করেছেন।

বুঝিলাম, এখন একটা কেরামতি না দেখাইতে পারিলে আর কোন রকমেই সম্মান থাকিবে না।

পরদিন একটি ভাল দূরবীন, একটি ঘড়ি এবং বগলে একটি পঞ্জিকা লইয়া গিয়া রাজসভায় হাজির হইয়া কহিলাম, মহারাজ, আজ আমি অসাধ্য সাধন করবো।

সভাশুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঘড়ি আর দূরবীন দেখিয়া রাজা কহিলেন, এ দু'টি কি জিনিষ? আমি গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম,—মহারাজ, এ আমার অসাধ্য সাধনের অপূর্ব্ব যন্ত্র।

রাজা উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, বেশ ভাল কথা, আজ আমরা সবাই দশম-রত্নের কৃতিত্ব দেখবো।

আগের দিন রাত্রে পঞ্জিকায় দেখিয়াছিলাম আজ সকাল নয়টায় সূর্য্যগ্রহণ সুরু হইবে এবং ঠিক সাড়ে দশটায় সূর্য্য রাহুমুক্ত হইবে।

রাজা বিক্রমাদিত্যকে গিয়া কহিলাম, মহারাজ, আজ আমি তপঃপ্রভাবে সূর্য্যকে গ্রাস করে ফেলবো। পৃথিবীতে কারও সাধ্য নেই—আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে।

নব-রত্ন আমার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাহাদের কথায় কাণ না দিয়া রাজাকে ঘড়িটা দেখাইয়া কহিলাম, দেখুন মহারাজ, এই বড় কাঁটাটা যখন এইখানে এবং ছোট কাঁটা এইখানে যাবে—ঠিক তখন

থেকে আমার যোগবলের ক্রিয়া সুরু হবে। এই বলিয়া বারটা এবং নয়টার ঘর দেখাইয়া দিলাম।

তারপর সাড়ে দশটার যায়গা দেখাইয়া দিয়া কহিলাম—বড় কাঁটাটা ঘুরে যখন এইখানে আসবে, তখন সূর্য্য আমার গ্রাসমুক্ত হবে। সম্রাট্, আমি আপনার নব-রত্নকে আহ্বান কচ্ছি, সাধ্য থাকে তাঁরা আমার গতিরোধ করুন।

আমাকে পাগল মনে করিয়া বিক্রমাদিত্যের নয়টি রত্ন পরস্পরের গা টিপিয়া মুচ্ কি মুচ্ কি হাসিতে লাগিল।

ঠিক নয়টার সময় সূর্য্যগ্রহণ সুরু হইল।

মহারাজকে ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য তাঁহার হাতে দূরবীনটা তুলিয়া দিয়া কহিলাম, মহারাজ, এই যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আপনি সব পরিষ্কার দেখ্তে পাবেন।

সেবার পূর্ণগ্রাস। সবাই অবাক্ হইয়া দশম-রত্নের অসাধ্য সাধন দেখিতে লাগিল।

দূরবীনটা রাজার হাত হইতে মন্ত্রীর হাতে, মন্ত্রীর হাত হইতে সেনাপতির হাতে—এমনি করিয়া রাজ্যশুদ্ধ সকলের হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

গ্রহণ যখন শেষ হইল তখন দেখি মহাকবি কালিদাস—দূরবীনটা হাতে করিয়া বেতাল ভট্টের দিকে মস্ত বড় একটা হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছেন!

নয়

রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া কল্পনা করিলাম—কাল রাজসভায় আমি কি রকম সম্মান পাইব!

সভায় প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক হইতে লোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া পাশের বন্ধুর কাণে কাণে কহিবে—ইনি রাজ-সভার দশম-রত্ন—কাল অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া সসম্মানে আমাকে তাঁহার ডান পাশে আসন করিয়া দিবেন। পুরস্কারস্বরূপ কত ধনরত্ন যে দিবেন তাহার ত' ইয়ত্তাই নাই!

মনের আনন্দে প্রায় সারারাত জাগিয়াই কাটাইলাম। শেষ রাত্রির দিকে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে। হঠাৎ কাণে গেল—কে যেন ডাকিতেছে—শীগ্‌গির বিয়ে করবে ওঠ।

তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। নিশ্চয়ই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে লোক আসিয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্য হয় নাই—তাই রাত্রেই লোক পাঠাইয়াছেন।

ভাবিলাম, রাজার জামাই হইতে যাইতেছি—একটু ভাল রকম সাজ-পোষাক করিয়া যাওয়া ভাল। দশম-রত্নের দরবারী বেশে বিবাহ-সভায় মানাইবে কি করিয়া?

পরিপাটি করিয়া সাজিয়া যখন বাহির হইলাম—রাত্রির অন্ধকার তখনও পরিষ্কার হয় নাই।

রাজ-অনুচরের পিছন পিছন খানিকদূর যাইতেই মনে হইল—তাইত! লোকটার বেশভূষা ত' বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভার মত মনে হয় না!

চমকিয়া দাঁড়াইলাম।

মনে একটু সাহস আনিয়া, গলাটা বেশ সাফ করিয়া নিয়া কহিলাম, ওহে, তুমি কোন্ রাজার লোক?

লোকটা পিছন ফিরিয়া দিব্যি আরামে একটি হাই তুলিল, তারপর আপন মনেই তুড়ি দিয়া কহিল, আমরা হবুচন্দ্র রাজার লোক—গবুচন্দ্র আমাদের মন্ত্রী। নাও বিয়ে কর ত' চট্‌পট চলে এসো!

কি সর্ব্বনাশ!

একেবারে মাথায় হাত দিয়া রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পড়িলাম। কোথায় বিক্রমাদিত্য—আর কোথায়—হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র তার মন্ত্রী! আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে তুলিল। কহিল, এরকম দেরী করে ফেল্‌লে ত' চল্‌বে না বাপু, ওদিকে আমাদের লগ্ন যে যায় যায়!

তারপর কাহাদের উদ্দেশ করিয়া হাঁক-ডাক দিয়া কহিল,

ওরে, তোরা সব গেলি কোথায়—জামাই কি হেঁটে যাবে নাকি ?—শীগ্‌গির চতুর্দ্দোলা নিয়ে আয়।

অন্ধকারে একদল লোক বোধকরি গুঁড়ি মারিয়া বসিয়াছিল —লোকটার ডাক শুনিয়াই ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া আসিয়া আমাকে আর কথা বলিবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত দিল না—হাত পা ধরিয়া ঠেলিয়া একটা চতুর্দ্দোলায় তুলিয়া দিল—হুঁশ-হুঁশ শব্দে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিল।

খানিক বাদে বুঝিলাম—চতুর্দ্দোলা আসিয়া প্রকাণ্ড একটি ফটক পার হইয়া রাজপুরীতে ঢুকিল। অনেক লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল।

কে আসিয়া চতুর্দ্দোলার দরজা খুলিয়া দিল, তারপর চার জন জোয়ান লোক—আমার চার হাত-পা ধরিয়া ঝপাৎ করিয়া এক দুধের চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলিয়া দিল। নাকে মুখে দুধ ঢোকায় চীৎকার করিয়া উঠিতে একজন কহিল, বিবাহের পূর্ব্বে এই ভাবে দুগ্ধ-স্নান করিয়া নেওয়াই নাকি প্রথা।

তারপর আর একটি মোটা-সোটা লোক আসিয়া আমায় আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই একটা ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। তারপর একটা লাল টক্‌টকে সাড়ী হাতে দিয়া কহিল, শীগ্‌গির এইটে পর—আর সময় নেই—

আমি সাড়ীটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, পাগল পেয়েছ নাকি ?—আমি কি মেয়ে ?

আরশুলা আর চামচিকা আসিয়া আমায় খাইয়া ফেলে আর কি !

চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ও মোটা কর্ত্তা—বিয়ে করতে এসে প্রাণে মারা যাবো নাকি ?

লোকটা বাহির হইতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, ভয় পাও কেন ? এ ত' স্ত্রী-আচারের রসিকতা !

আর সহ্য হইল না ! মানুষের শরীর ত' ! হবুচন্দ্র রাজার রাজ্যের কাণ্ড কতদূর গড়ায়—এতক্ষণ তাই দেখিতেছিলাম। এইবার সত্যিই রাগ হইল। ভাবিলাম, জানলার ভিতর দিয়া একটা বর্শা ছুঁড়িয়া মারিয়া মোটা লোকটার পেট ফাঁসাইয়া দিই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! মনে মনে ভাবিতেও হাতে বর্শা আসিল না ! চাহিয়া দেখি আঙুলে আমার আংটি নাই।

কি সর্ব্বনাশ ! পুরোহিত বিবাহের সময় আংটি বদল করাইয়া দিয়াছিল যে ! এখন উপায় ?

মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম।

দশ

কতক্ষণ সেইভাবে পড়িয়া ছিলাম জানি না—হঠাৎ দেখি পেছনকার এক ছোট্ট দরজার ফাঁক দিয়া সামান্য একটু আলোর ছিটা দেখা যাইতেছে।

আবার কিছু নতুন মতলব নাকি? ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

ফিস্ ফিস্ করিয়া কে যেন কহিল, শীগ্‌গির পালাবে ওঠ।

অবাক্ হইলাম। পালাবো—তার মানে?

অন্ধকারের মধ্য হইতে জবাব আসিল, আমি হবুচন্দ্র রাজার মেয়ে।

বটে! তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি সত্যি তাই। ছোট্ট একটা নিবু নিবু প্রদীপ হাতে করিয়া রাজকন্যা পেছনকার চোরা-দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে।

আমি কহিলাম, পালাবো কেন?

মেয়েটি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, এদেশের নিয়ম বুঝি জান না? কাল রাজসভায় সকলের সামনে—বাবা তোমায় রাজসিংহাসনে বসাবে, মাথায় রাজমুকুট তুলে দেবে—আর হাতে দেবে রাজদণ্ড।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলাম, তবে ত' মজাই! হবুচন্দ্র রাজার রাজ্যে—আমি হব রাজা—

রাজকন্যা মাথা নীচু করিয়া কহিল, কিন্তু তারপর সন্ধ্যাকালে—জল্লাদ তোমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে মাথা কেটে ফেল্‌বে।

এইবার সত্যিই আঁৎকাইয়া উঠিলাম। মাথা কেটে ফেল্‌বে? —এ যে বড় সাঙ্ঘাতিক রসিকতা। কিন্তু কেন?

মেয়েটি তেমনি ঘাড় নীচু করিয়া কহিল, এই এদেশের প্রথা।

সর্ব্বনাশ, তবে উপায়?

রাজকন্যা গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, যদি বাঁচতে চাও তবে শীগ্‌গির এই চোরা-দরজা দিয়ে পালিয়ে যাও—আর কথা বলবার সময় নেই।

প্রাণের মায়া বড় মায়া—রাজকন্যার কথা শেষ হইতে না হইতেই এক রকম তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াই একেবারে অন্ধকারের মাঝখানে চোঁ-চোঁ দৌড়।

কতক্ষণ যে ঐ ভাবে প্রাণপণ ছুটিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না—অন্ধকারের ভিতর দিয়া কোথা হইতে যে কোথায় হাজির হইলাম তাহাও জানি না। হঠাৎ ঝুপ্ করিয়া একটা পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গেলাম—হয়ত দুই এক ঢোক জলও খাইলাম। এমন সময় দুইটি লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং সোজা রাজার কাছে নিয়া হাজির করিল।

"যদি বাঁচতে চাও তবে শীগ্‌গির এই চোরা দরজা দিয়ে পালিয়ে যাও—আর কথা বলবার সময় নেই।"

তাহাদের একজন আমাকে সচেতন করিয়া দিল, সাবধানে কথা বোলো বন্দী, তোমার সামনে চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণসিংহ? তাহা হইলে কোথা হইতে কোথায় আসিলাম!

সিংহাসন হইতে লক্ষ্মণসিংহ কহিলেন, তুমি যে আলা-উদ্দিনের গুপ্তচর তা' আমরা ধরে ফেলেছি। মনে করেছিলে সবার অলক্ষ্যে সরোবরের ভেতর দিয়ে সাঁতরে এসে আমার দুর্গে প্রবেশ করবে? দূত অবধ্য। কিন্তু গুপ্তচরের কি শাস্তি তা জানো? তোমায় আজীবন আমার কারাকক্ষে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তার আগে কি তোমার উদ্দেশ্য, তা জানতে চাই।

আমি কহিলাম, এমন কিছু মহৎ উদ্দেশ্য আমার নেই—এক যায়গায় বিয়ে করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে আপনার সরোবরের মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছিলুম. এমন সময় আপনার লোক আমায় বন্দী করে নিয়ে আসে। আমাকে আর যাই বলুন, আমি কারও গুপ্তচর নই।

এক সামন্ত-রাজ কহিলেন, তোমার সম্বন্ধে রাণা যা বল্লেন, আমাদের প্রত্যেকেরই ধারণা ঠিক তাই। কেননা অন্ধকারের মধ্যে সরোবরের ভেতর দিয়ে সাঁতরে আসার কারণ কিছুই হতে পারে না। আজীবন কারাবাসই তোমার একমাত্র দণ্ড।

রাণাও সিংহাসন হইতে মাথা নাড়িয়া তাঁহার সম্মতি জানাইলেন।

ইঙ্গিতমাত্র একটি প্রহরী আমার হাত দুটি বাঁধিয়া কারাগারের দিকে লইয়া চলিল।

কাজেই সত্য সত্যই বন্দী হইতে হইল।

ভাবিলাম, এখন উপায়?—এতদিন হাতে আংটি ছিল, বিপদকে বিপদ বলিয়াই গ্রাহ্য করি নাই। ভাবিয়াছি—হাতে যখন অস্ত্র আছে, যত বড় ভয়ই মাথার উপর আসুক না কেন—ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিব। কিন্তু এইবার যদি সত্য সত্যই আজীবন বন্দী থাক্‌তে হয়, তবে ত' গেছি!

দিন তিনেক বাদে একদিন গভীর রাত্রে রাজ-অন্তঃপুর হইতে ভীষণ কান্নার শব্দ আসিতে লাগিল। ভাবিলাম, ব্যাপার কি? আলাউদ্দিন কি হঠাৎ আবার চিতোর আক্রমণ করিল? তা করিলেই বা! চিতোরের মেয়েরা ত' আর বাঙালীর কনে বৌ নয়—যে অম্‌নি মরা-কান্না সুরু করিবে? কিন্তু আর্ত্তনাদ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

ব্যাপারটা ত' তাহা হইলে সত্যিই জানা দরকার।

যে প্রহরীটি রাত্রে আমার দরজার সাম্‌নে পাহারা দিত ইতিমধ্যে তাহার সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছিলাম। তা'ছাড়া লোকটিও বেশ ভাল।

ডাকিয়া কহিলাম, ওগো প্রহরী ভাই, এ কান্নাকাটি কিসের?

অবাক্ কাণ্ড! চাহিয়া দেখি প্রহরীও চোখের জল মুছিতেছে। কহিল, ভাই, চিতোরের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আলাউদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতা করে রাণা ভীমসিংহকে বন্দী করেছেন। তারপর চিতোরে দূত পাঠিয়েছেন,—রাণী পদ্মিনীকে না পেলে ভীমসিংহকে ছেড়ে দেবেন না।

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, এখন তাহলে সমস্যা হচ্ছে রাণীকে কেমন করে বাঁচানো যায়! কেমন? সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি, যদি একবার রাণীর সঙ্গে আমায় দেখা করিয়ে দিতে পার?

প্রহরী তখনই ছুটিল, রাণার কাছে অনুমতি চাহিতে। পাওয়ারও বেশী দেরী হইল না।

রাণী পদ্মিনীর কক্ষে হাজির হইয়া দেখি তিনি মেঝেতে চুল এলাইয়া দিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন।

ইতিহাস পড়িয়া পড়িয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, রাণী পদ্মিনীর মত সুন্দরী ভূ-ভারতে নাই। কিন্তু একবার চোখের চাওয়াতেই বুঝিলাম, এমনটি বুঝি কল্পনাও করা যায় না। যেন একেবারে সাক্ষাৎ ভগবতী!

তিনি আমায় দেখিয়া কহিলেন, বাছা, তুমি নাকি আমার বাঁচ্‌বার উপায় করে দিতে পারবে? বলত' কি করে রাণাকে বাঁচাবো—আমি নিজে রক্ষা পাবো?

কহিলাম, মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি সব ব্যবস্থা

করে দিচ্ছি। আগে আপনি দিল্লীতে দূত পাঠান—যে আপনি আলাউদ্দিনের কাছে যাচ্ছেন।

রাণী পদ্মিনী আমার মুখের উপর তাঁহার চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এ তুমি কি বল্‌ছ বাছা? আমি যাবো দিল্লীতে?

কহিলাম, মা তা নয়, সেই সঙ্গে খবর পাঠান—আপনার সঙ্গে সাত শ' দাসী যাবে সাত শ' পাল্কীতে। কিন্তু সেই পাল্কীতে দাসীর বদলে থাক্‌বে—চিতোর-সন্তানরা।

এইবার রাণী পদ্মিনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কাছে আসিয়া আমার শির চুম্বন করিয়া কহিলেন, বাছা, তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। বোধকরি এ যাত্রায় তুমিই আমায় রক্ষা করলে।

মনে মনে নিজের বুক ঠুকিয়া কহিলাম, ভাগ্যিস ইতিহাস-খানা পড়া ছিল, তাই রাণী পদ্মিনীর কাছে সম্মান পাইলাম।

সেইদিন রাত্রিতেই দাসীর বদলে সাত শ' চিতোর-সৈন্য পাল্কী করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইল।

তার মধ্যে কলিকাতা-নিবাসী রন্টু যে একটি পাল্কী অধিকার করিয়া দিব্যি আরামে নাক ডাকাইতে সুরু করিল, তাহা কোন ঐতিহাসিকই এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

এগারো

বেশ মনের আনন্দেই দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছিলাম। মাঝ রাস্তায় গিয়া রাণী পদ্মিনীকে কহিলাম, আপনি এক কাজ করুন—আলাউদ্দিনের কাছে আমাদের পৌঁছুবার আগেই এক দূত পাঠিয়ে দিন যে, আপনি রাণা ভীমসিংহের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে তবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—আর সেই সময় তাদের কোন সৈন্য সেখানে উপস্থিত থাক্‌তে পারবে না।

দূত পূর্ব্বেই গিয়া আলাউদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুমতি চাহিয়া রাখিল। তারপর যথাসময়ে রাণী পদ্মিনীর চতুর্দ্দোলা গিয়া দিল্লীর কারাকক্ষের ভিতর হাজির হইল।

পূর্ব্ব হইতেই সৈন্যদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাণী পদ্মিনী ক্ষিপ্রগতিতে ভীমসিংহের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে লইয়া চতুর্দ্দোলায় উঠিলেন। আমি কহিলাম, এখুনি আবার আমাদের চিতোরে ফিরে যেতে হবে। রাণী পদ্মিনীর সাত শ' দাসী—তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই ফিরিয়া যাইবে—আগে হইতে সে অনুমতিও নেওয়া হইয়াছিল।

পদ্মিনী তাঁহার কাছে আসিবেন এই উল্লাসে আলাউদ্দিন সব প্রার্থনাই মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এখন সেই সুযোগ লইয়া অন্যান্য পাল্কীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনীর পাল্কীও দিল্লীর ফটক পার হইয়া আসিল।

কিছুদূর আসিতেই পেছনে একটা কোলাহল শুনিয়া পাল্কীর ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি—জ্বলন্ত মশাল লইয়া আলাউদ্দিনের সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিতেছে। বুঝিলাম আলাউদ্দিন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া পদ্মিনীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

এখন উপায়! সেই দৃশ্য দেখিয়া পাল্কীর ভিতর বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

কিন্তু রাজপুত বীর বটে!—সেই সাত শ' পাল্কীর জোয়ান —সাত শ' চিতোর-সৈন্য লাফাইয়া নামিয়া এমন যুদ্ধ সুরু করিয়া দিল যে আজও মনে হইলে গায়ে কাঁটা দেয়।

ততক্ষণে রাণী পদ্মিনীর চতুর্দ্দোলা—পগার পার।

কিন্তু সেই বিপদ হইতে আমি কি করিয়া রক্ষা পাই? পালানোই শ্রেয়ঃ, এই মনে করিয়া আমি পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

বাহিরে আসিতেই সামনের দিকে একটা খট্ খট্ আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখি, একটি মুসলমান সৈন্য মাটিতে মরিয়া পড়িয়া আছে—আর তাহার ঘোড়াটি সেইখানে দাঁড়াইয়া সাম্‌নের এক পা দিয়া খট্ খট্ শব্দ করিতেছে।

বুঝিলাম—পালাইবার এই একমাত্র সুযোগ। বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে উঠিলাম। ঘোড়া ইঙ্গিত পাইয়া বাতাসের মত ছুটিয়া চলিল।

খানিকটা পথ গিয়াই ঘোড়া বুঝিতে পারিল, আমি পাকা

সোয়ারী নই। হঠাৎ পেছনের দুইটি পা তুলিয়া এমন করিয়া আমাকে এক ঝাঁকুনি দিল যে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ঘোড়াটি লাফাইতে লাফাইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

অসহ্য যন্ত্রণায় পা দুইটি কন্ কন্ করিতে লাগিল। হঠাৎ অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া কোথা হইতে দুইটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

একজন আমার চোখের সামনে লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, একে দিয়েই হবে ভাই—

দ্বিতীয় লোকটিও মাথা নাড়িয়া সায় দিল—তারপর আর কেহ দ্বিরুক্তি না করিয়া দুইজনে আমাকে তুলিয়া লইয়া কোন্ দিকে যেন হন্-হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

তারপর কতক্ষণ বোধকরি আমার জ্ঞান ছিল না। যখন চোখ মেলিলাম—দেখি আমি একটি ছোট কামরার ভিতর আসিয়াছি। কারা যেন ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে!

হঠাৎ দেখি লেপের তলা হইতে কে একজন মুখ বাহির করিয়া হো-হো শব্দে হাসিতে লাগিল।

তাইত! মুখটি ত' খুবই চেনা-চেনা লাগে, কোথায় যেন দেখিয়া থাকিব। হ্যাঁ, মনে হইয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় বটে! কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লোকটি তাহার লেপ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—তারপর একলাফে হাসিতে হাসিতে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল।

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম, মহারাজ শিবাজী!

লোকটি তেম্নি হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ আমিই শিবাজী। কিন্তু এ যাত্রা তোমায় আমাদের রক্ষা করতে হবে।

এবার সত্যই আমার হাসি পাইল। আমি রক্ষা করিব মহারাজ শিবাজীকে? কহিলাম, মহারাজ, আমায় ধরে এনে এভাবে ঠাট্টা করার মানে কি বুঝ্‌তে পারছি নে।

শিবাজী আমার একখানি হাত ধরিয়া কহিলেন, ঠাট্টা নয় ভাই, ঔরংজেব আমাকে আর আমার ছেলে শম্ভুজীকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু আমরা যদি এখান থেকে পালাবার কোন উপায় না করি ত' মৃত্যু নিশ্চিত। তুমি মোগল নও, হিন্দু; সেটুকু বুঝতে পেরেই ত পরামর্শের জন্যে তোমায় ধরে আনা হয়েছে!

আমি কহিলাম, পালাবেন তা ত' বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু চারদিকে কি সতর্ক প্রহরী নেই?

শিবাজী কহিলেন, সেই জন্যেই ত' ভাই তোমার সাহায্য চাই, তোমার পরামর্শ চাই।

আমি কহিলাম, মহারাজ, পলায়নের এমন ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি—যাতে আপনার কোন লোকক্ষয়ও হবে না—অথচ আপনি নির্ব্বিঘ্নে কারাকক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারবেন।

শিবাজী উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, কি সে উপায়? আমি ত' কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি নে।

ইতিহাসখানা মনে মনে একটু আলোচনা করিতেই সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমি কহিলাম, মহারাজ, কাল থেকে আপনার লোকজন প্রচার করে দিক্ যে, আপনারই মঙ্গল কামনায় তারা প্রত্যহ দিল্লীর ব্রাহ্মণদের মিষ্টান্ন বিতরণ করবে। তারপর চলবে মিষ্টান্ন বিতরণের পালা—ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন কারাকক্ষ থেকে রোজ বাইরে যেতে পারবে—তারপর একদিন—

মহারাজ শিবাজী যেন আমার ভিতরটা একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, হয়েছে—হয়েছে—তারপর একদিন সুযোগ বুঝে—আমরা দু'জন ঝুড়িতে চেপে—

আমি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলাম, —একেবারে চম্পট।

শিবাজী হো-হো শব্দে প্রাণখোলা হাসি হাসিতে লাগিলেন, তারপর আমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, অদ্ভুত বুদ্ধি তোমার!

যথারীতি মিষ্টান্ন বিতরণ চলিতে লাগিল।

তারপর একদিন সত্যই সুযোগ বুঝিয়া শিবাজী মহারাজ তাঁহার ছেলেকে লইয়া একটি ঝুড়ির ভিতর উঠিয়া বসিলেন।

মারাঠারা ইঙ্গিত পাইবামাত্র নিঃশব্দে ঝুড়ি লইয়া কারাগার পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর রাজপথ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমিও কৌশলে এক ঝুড়িতে চাপিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। কথা ছিল—দিল্লী সহরের শেষ সীমায় তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব। ঊর্দ্ধশ্বাসে আপন মনে ছুটিতে ছুটিতে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। কাহাকেও রাস্তা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। কি জানি যদি শিবাজীর পলায়ন-বার্ত্তা কোন রকমে প্রকাশ হইয়া পড়ে—আমারও নিস্তার নাই। বহু পথ ঘুরিয়া অনেক কষ্টে যখন নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইলাম—মারাঠিরা তখন সবাই চলিয়া গিয়াছে।

শিবাজী মহারাজ আশ্বাস দিয়াছিলেন—মারাঠায় গেলে একটা মস্ত বড় জায়গীর পুরস্কার দিবেন। কিন্তু এখন রাস্তা চিনিয়া যাই কি করিয়া।

হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া দেখি—মোগল সৈন্যেরা মার মার শব্দে বোধকরি শিবাজীর সন্ধানেই বাহির হইয়াছে। চট্ করিয়া একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম।

সর্ব্বশেষ সৈনিকটি যেই মোড় ঘুরিয়া চলিয়া যাইবে—ঠিক সেই সময় আড়াল হইতে বাহির হইয়া গায়ের উত্তরীয় দিয়া ঘোড়ার পেছনকার পায়ের সঙ্গে এমন এক ফাঁস লাগাইলাম যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সৈনিক বাবাজী ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান। শিক্ষিত ঘোড়া, সৈনিকের পতনে সেও সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

বুঝিলাম এই সুযোগ—চট্ করিয়া সৈনিকের সঙ্গে পোষাক বদল করিয়া—লাফ দিয়া ঘোড়ায় গিয়া উঠিলাম। তারপর তড়িৎবেগে সেই সৈন্যদলের সঙ্গে বেমালুম ভিড়িয়া গেলাম।

বারো

সৈন্যদলের সঙ্গে বেশ ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছি! যে সৈনিক আমার পাশে পাশে চলিয়াছিল—ধীরে ধীরে সে আমার সঙ্গে বেশ গল্প সুরু করিল।

কহিল, ভায়া, অনেক দিন যুদ্ধ না করে করে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি—এইবার দিন কয়েক তলোয়ার ঘোরানো চল্‌বে।

আমি তাদের কথার ধরণটা নকল করিয়া কহিলাম—মারাঠাদের সঙ্গে কি আমাদের যুদ্ধ করাই স্থির?

সৈনিক মাথা নাড়িয়া কহিল, তা একরকম স্থির বৈকি! কিন্তু যদি শিবাজীকে হাতে হাতে ধরতে পারি, তবে ত' কোন কথাই নেই—

আমি ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিলাম, বেশ মোটা রকম পুরস্কার পাওয়া যাবে বুঝি?

সে উল্লসিত হইয়া কহিল, মোটা বলে—মোটা। প্রথমে—খেতাব ত' একটা মিলবেই—তারপর বড় রকম জমিদারী কি আর না পাওয়া যাবে!—নসীবে থাক্‌লে একেবারে প্রধান সেনাপতিও হয়ে যেতে পারি।

তারপর খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার হিংস্র চোখ দুইটাকে বিস্ফারিত করিয়া কহিল, ওঃ—আমি যদি শিবাজীকে

সাম্‌না সাম্‌নি পাই ত' ওই খেতাব আর জমিদারী আমারই প্রাপ্য। অন্ধকারে তার সেই চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল।

বুঝিলাম, ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। শিবাজীর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—কিন্তু আমার স্বরূপটা যদি একবার ধরিতে পারে তবে মাথা আর দেহ এক সঙ্গে থাকিবে না! স্থির করিলাম, রাত্রিতে পলায়ন করিব।

গভীর রাতে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। মাঠের মাঝখানে তাঁবু ফেলা হইয়াছে! একেবারে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস চারিদিকে হু-হু শব্দে বহিতেছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়া বাতাস আসিয়াই শরীর কাঁপাইতেছিল। তাঁবুর বাহিরে গেলে না জানি কি হয়!

কিন্তু শীতের ভয়ে বসিয়া থাকিলে ত' চলিবে না। বিছানার কম্বলখানা টানিয়া তুলিয়া তাই দিয়া শরীরটাকে বেশ করিয়া জড়াইয়া একেবারে মাঠের মাঝখান দিয়া ছুটিতে সুরু করিলাম। চারিদিকে অমাবস্যার জমাট অন্ধকার—তার উপর কন্‌কনে বাতাস, আমি একা প্রাণী প্রাণভয়ে কুকুরের মত ছুটিয়া চলিয়াছি।

হঠাৎ কিসের সঙ্গে পা জড়াইয়া গেল, একেবারে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—কেউ পিছু নেয় নাই ত'?—তাহা হইলে আর কোনমতেই উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

ভয়ে ভয়ে উঠিলাম। হাত দিয়া দেখি মস্ত বড় একটি দড়ি।

ভাল করিয়া তাকাইতেই বুঝিতে পারিলাম—ঠিক আমার সামনেই প্রকাণ্ড এক নদী। সেই নদীর ধারে মস্তবড় একটা নৌকা দড়ি দিয়া লগির সঙ্গে বাঁধা। নৌকার ভিতর হইতে সামান্য একটা আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। দড়ির সঙ্গে পা আট্‌কাইয়া যাওয়ায় আমি হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঐখানে পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই কোনমতে প্রাণটা বাঁচিয়া গেল। নতুবা একেবারে ছুটিতে ছুটিতে নদীর গর্ভে গিয়া পড়িতাম।

ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া সবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি—ঠিক এমনি সময় কে একজন বৃদ্ধ একটা কালো উত্তরীয়তে দেহ আবৃত করিয়া নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

তারপর চাপা গলায় কহিলেন—"কে ?—কে তুমি ?"

জবাব দিলাম—আমি এক বিপন্ন পথিক। কিন্তু আপনি কে ?—

বৃদ্ধ ভাল করিয়া আমাকে দেখিলেন। তারপর হাতটা কপালের উপর তুলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিলেন, আশেপাশে আর ত' কেউ নেই ?

বুঝিলাম, বৃদ্ধ আমার চাইতেও ভয় পাইয়াছেন। কহিলাম, না, নেই, কে আপনি, আজ রাত্রের জন্যে এই নৌকায় আমায় আশ্রয় দিতে পারেন ?

বৃদ্ধ গলা আরও খাটো করিয়া কহিলেন, আমি লক্ষ্মণ সেন! চুপ্—শত্রুরা আমার পেছু নিয়েছে।

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম—লক্ষ্মণ সেন? কোন্ লক্ষ্মণ সেন আপনি?

বৃদ্ধ ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিলেন, আস্তে কথা বল। আমি বাঙ্লার রাজা লক্ষ্মণ সেন। শত্রুরা আমার রাজ্য আক্রমণ করেছিল। প্রাণভয়ে আমি খিড়কীর দোর দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

আমি কহিলাম, কিন্তু আপনি যুদ্ধ করলেন না কেন?

লক্ষ্মণ সেন কহিলেন, যুদ্ধ করবো কি বাপু, একে আমি বুড়ো মানুষ, তার ওপর গণৎকাররা গণনা করে বল্লে, আমার রাজ্য আর টিকবে না। তাই ভাবলুম মিছিমিছি শেষ বয়সে আর লোকক্ষয় করে লাভ কি? শেষটা খিড়কীর দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম। তুমি আমার নৌকায় এসো। তাতে আমি একটু সাহস পাবো। বোধকরি শত্রুরা আমার পেছু নিয়েছে।

আমি তাঁহার নৌকায় উঠিয়া কহিলাম, কিন্তু যাই বলুন আপনার যুদ্ধ করা উচিত ছিল। এত সহজে আপনি রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন?

বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, আরে বাপু, তোমাদের মত কচি বয়েস হলে—আমিও তরোয়াল বাগিয়ে যুদ্ধ করতে নাবতুম। উঃ, ছেলেবেলায় কি কম যুদ্ধটা করেছি! এখন দেহেও বল নেই—তাই মনে ভয় বাসা বেঁধেছে।

চাহিয়া দেখিলাম—সত্যিই লক্ষ্মণ সেনের অনেক বয়স হইয়াছে। তাহার উপর শত্রুর আশঙ্কা করিয়া তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না।

আমি তাঁহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া কহিলাম, আপনি বিশ্রাম করুন। শত্রুরা বোধকরি রাত্রে আর আপনার পেছু নেবে না।

তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না নেবে না? ওই বাইরে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

তাড়াতাড়ি নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখি সত্যিই তাই—! দলে দলে সব সৈন্যেরা মশাল হাতে ছুটিয়া আসিতেছে।

লক্ষ্মণ সেন কহিলেন, এখন উপায়?

আমি কহিলাম, দেখুন, আপনার এই নৌকা দেখেই বোধকরি ওরা বুঝ্‌তে পেরেছে যে আপনি এখানে আছেন। আপনি আমার সঙ্গে নেবে পড়ুন, আর মাঝিদের বলুন—তারা খুব জোরে নৌকা চালিয়ে যাক। তা হ'লে ওরা মনে করবে—আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন। তারা নৌকারই পেছু নেবে।

লক্ষ্মণ সেন আমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা আদেশ পাইয়া বদর বদর বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

লক্ষ্মণ সেন সেই ঠাণ্ডায় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, কিন্তু এরা যে এসে পড়্‌ল—এখন কি করি?

আমি কহিলাম, আসুন আমরা খানিকক্ষণ নদীতে ডুবে থাকি—ওরা নৌকার পেছু নিয়ে এগিয়ে গেলেই আবার উঠে পড়্‌ব।

প্রাণের দায়ে বৃদ্ধ রাজা সত্য সত্যই আমার সঙ্গে জলে নামিলেন। তারপর দুইজনে একসঙ্গে ডুব দিলাম।

কতক্ষণ জলের ভিতর ডুব দিয়া ছিলাম জানি না—কাহার আচম্‌কা টানে ভুস্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু যেখানে ডুব দিয়াছিলাম—এ ত' সে জায়গা নয়। সে ছিল—অন্ধকার রাত আর সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ সেন—কিন্তু এবার উঠিয়াই একেবারে তাজ্জব বনিয়া গেলাম!

এ যে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট!

যে লোকটা আমাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছিল, সে কহিল, চল—তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলাম, কি, লক্ষ্মণ সেনের কাছে?

লোকটি ধমক দিয়া জবাব দিল, কে তোর লক্ষ্মণ সেন? যেতে হ'বে—স্বয়ং কালাপাহাড়ের কাছে!

বুঝিলাম, আবার ঘূর্ণিপাকের পাকে পড়িয়াছি! এ ত' নূতন কিছু নয়—নিত্যকার ব্যাপার!

তবু মুখখানাকে যথাসম্ভব ভালোমানুষের মতো করিয়া কহিলাম, কিন্তু বাপু, আমি কালাপাহাড়ের কাছে গিয়ে কি করবো? আমি ত' আর মন্দির ভাঙ্‌তে পারবো না।

লোকটা যেন ভ্যাংচাইয়া উঠিল!

কহিল, আর রসিকতা করতে হ'বে না—! কালাপাহাড় কি আদেশ দিয়েছে জান ত? আদেশ দিয়েছে এই যে, হিন্দু মন্দির দেখ্‌লেই তাকে তক্ষুনি ভেঙ্গে ফেলা হবে—আর হিন্দু দেখলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হ'বে ধরে। ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথম তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হ'বে—তারপর ঢালা হ'বে সেই মাথায় ঘোল—তারপর নাক-কাণ কেটে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দেওয়া হ'বে।

এইবার সত্যই আঁৎকাইয়া উঠিলাম।

মাথা মুড়ানোটা না হয় সহ্য করা চলে—কেননা—একমাস বাদেই আবার চুল উঠিবে! ঘোল ঢালিলেও আপত্তির কারণ নাই, কারণ ভয়ে-চিন্তায় মাথা গরম হইয়াই আছে!

কিন্তু ঐ শেষের কথা দুইটিই সাজ্ঞাতিক! নাক-কাণ কাটিয়া দেওয়া!

ওরে বাবা! এ তো আর চুল নয় যে আবার গজাইবে। কাজেই একটু ভাবিত হইয়া পড়িলাম।

আমাকে ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে তুলিয়া লইয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিল।

অনেকটা রাস্তা ঐ ভাবে যাইতে হইল···হাত-পা ছড়িয়া গেল—যায়গা-যায়গা দিয়া রক্তও বাহির হইতে লাগিল—কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত লোকটার হাতের মুঠি একটুও শিথিল হইল না।

শেষকালে আমাকে নিয়া যেখানে হাজির করিল, ইতিমধ্যে সেখানে বহুলোক ধরিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম।

যে লোকগুলি আছে, তাহাদের দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একদল—যাহাদের নতুন ধরা হইয়াছে কিন্তু শাস্তি এখনও হয় নাই! আর একদল—যাহাদের মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া···নাক-কাণ কাটিয়া রাখা হইয়াছে···এইবার দেশের বাহির করিতে যা' বাকি!

উঃ সে কি সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য! দেখিয়াই আমি মূর্চ্ছা যাইতেছিলাম···একটী লোক আসিয়া আমার মাথায় এক কলসী ঘোল ঢালিয়া দিতে তবে একটু সুস্থ বোধ করি।

রাত্রি আসিল।

দেখি আমার পাশেই এক আশী বছরের বুড়ো···! সে আপন মনে চোখ বুজিয়া গোঙাইতেছে।

আস্তে আস্তে ডাকিলাম, ও মশাই শুন্‌ছেন···?

লোকটি যেন চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠিল। কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, এখনই নিয়ে যাবে নাকি নাক কাট্‌তে? আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলাম, না—না ভয় নেই···আমাকেও আপনারই মতো ধরে এনেছে—

বৃদ্ধ নাকি সুরে কহিল, আর বাবা ভয় নেই—দু' দণ্ড আগে আর পরে। মরতে ত' বাপু ভয় পাইনেঁ···কিন্তু পাষণ্ডটা যে একেবারে জখম করে রেখে দেবে···এই ত আমার চিন্তা!

আমি কহিলাম, আপনি চেনেন নাকি কালাপাহাড়কে?

বুড়ো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, চিনি আবার না···

ছেলেবেলায়···আমি নিজে হাতে ওকে মানুষ করেছি···গাছে উঠে কত আম-জাম পেড়ে খাইয়েছি···নিজে হাতে লাঠি খেলা শিখিয়েছি! আজ সে কথা ওর মনেও পড়বে না!

আমি কহিলাম, ও, আপনি কালাপাহাড়ের এক গাঁয়ের লোক—সেই জন্যেই এই বুড়ো বয়সেও ওর আপনার ওপর এত আক্রোশ।

বুড়ো মাথা নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ—বাবা···

আমি কহিলাম, আচ্ছা, আপনি তাকে বুঝিয়ে বল্লেন না কেন···? কেন তাকে এই ধ্বংসলীলা থেকে ফেরালেন না?

বুড়ো কহিল, চেষ্টা করে কোনো ফল নেই।

আমি মরিয়া হইয়া কহিলাম, কিন্তু এতগুলো নিরীহ লোকের কি বাঁচবার কোনো আশাই নেই?

বুড়ো আর একবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তারপর খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া কহিল, উপায় একটা আছে।

—উপায় আছে!

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোর মধ্যে পাইলাম।

কহিলাম, কি উপায় আমায় বলুন—আমি যেমন করে পারি তার ব্যবস্থা করবো—দিনের পর দিন এমন করে এই অত্যাচার সহ্য করা যাবে না—

বৃদ্ধ কহিল, তোমার বয়স অল্প···কিন্তু এত উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই···তবু তুমি শুনতে চাইছ, শোনো—

বুড়ো সুরু করিল:

এই কালাপাহাড়ের এক মাসী আছে। এই মাসীকে সে যেমন ভালোবাসতো বুঝি তার মাকেও তেমন বাসতো না।

সেই মাসী বোনপোর এই কুকীর্ত্তি দেখে রাগে দুঃখে পাগলের মত হয়ে এই কাশীতে চলে এসেছে। সে এখন কাশীতেই আছে। শুনেছি রোজ শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে যায়। আর অঞ্জলি পূরে জল নিয়ে তা ফের ফেলে দিয়ে বলে 'নিপাত যাও!'

কিন্তু কেই বা তাকে গিয়ে খবর দেবে! সে যদি একবার কালাপাহাড়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ত' তার সাধ্যও হ'বে না মুখ তুলে কথা বলে!···তুমি যাবে বাবা একবার তার খোঁজে?

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম, আমি! আমি কি করে যাই! আপনিও যেমন বন্দী আমিও ত' ঠিক তাই।

বুড়ো মাথা নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। বুড়োর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, আমি যাবো সেই মাসীর কাছে···

এইবার বৃদ্ধ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বেশী চ্যাঁচামেচি কোরো না বাবা—এক্ষুনি পাহারাওলার দল এসে মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে যাবে।

আমি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলাম, না, আপনি ব্যস্ত হবেন

"—নিপাত যাও—নিপাত যাও—"

না—মাথা আমার ঠিকই আছে। তবে যে কথা বলেছি···
মাসীর কাছে আমায় যেতেই হবে—আপনি চুপ করে শুয়ে
থেকে দেখুন না—

অল্প কয়েক মুহূর্ত্ত বাদেই খুট্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল।

দেখি একটা লোক কাপড়ে ঢাকা দিয়া কি সব খাবার
আনিতেছে। প্রহরী দরজা খুলিয়া দিয়া বাহিরেই অপেক্ষা
করিতে লাগিল, আর যে লোকটা খাবার আনিয়াছিল সে
ভিতরে ঢুকিল।

চট্ করিয়া দরজার পাশে সরিয়া গিয়া একটা লোহার
ডাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় এমন জোরে আঘাত করিলাম যে,
সে আর 'টুঁ' শব্দটি করিবার সময় পর্য্যন্ত পাইল না।

কিন্তু ভাবিবারও সময় নাই···তাড়াতাড়ি তাহার পোষাক
খুলিয়া নিজে পরিতে লাগিলাম।

বুড়ো হঠাৎ পাশ ফিরিয়া ঐ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিতে
যাইতেছিল—আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম।

ইসারায় তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তৈরী হইয়া
নিলাম।

বাহির হইতে প্রহরীর হাঁক্ শোনা গেল, ওরে খাবার দিতে
তোর ক' মাস লাগে শুনি?

নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, আবার তোকে আস্‌তে হ'বে নাকি?

আমি কথা না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া

জানাইলাম—না ; তারপর একেবারে ফটকের বাহিরে আসিয়া গঙ্গার পথে পা চালাইয়া দিলাম।

দুই একটি পথিককে জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা গঙ্গার সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিল।

প্রায় আধঘণ্টা পথ চলিবার পর—গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আঃ! চোখ জুড়াইয়া গেল! এতক্ষণ বন্ধ ঘরে থাকিয়া পৃথিবীকে যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কী সুন্দর এই পৃথিবী!

তারপর গঙ্গার তীর ধরিয়া এক মাইলটাক্ রাস্তা খুঁজিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু কোথায় সে মাসী…?

আবার ছুটিলাম তারি সন্ধানে…তার উপর এতগুলি লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে!

হ্যাঁ, হঠাৎ নজরে পড়িল…এক বুড়ী…শণের মতো তার পাকা চুল…দাঁতগুলি সব পড়িয়া গিয়াছে…হাতে আঁজ্লা করিয়া জল তুলিতেছে…আর আপন মনে বলিতেছে—নিপাত যাও—নিপাত যাও—আবার জল ফেলিয়া দিতেছে!

আমি আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া তাহার কাছে যাইয়া বলিলাম, মাসী, আপনাকে এক্ষুনি যেতে হ'বে আমার সঙ্গে নইলে—হাজার হাজার লোকের জীবন-সংশয়—

মাসী আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, যেতে হ'বে—? কোথায়?

আমি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম, কালাপাহাড়ের কাছে…

মাসীর চোখ দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল,...রাগে আগুন হইয়া আর এক অঞ্জলি জল গঙ্গা হইতে উঠাইয়া আবার তখুনি তাহা ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিপাত যাও—

আমি কহিলাম, মাসী, এরকম করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে অভিশাপ দিলে কিছু হ'বে না—আপনি গিয়ে তার সাম্‌নে একবার দাঁড়ান তবেই তার আগেকার সুবুদ্ধি ফিরে আসবে... সে এই অমানুষিক কাজ তা' হলে আর করবে না—

এইবার মাসী ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সত্যি বল্‌ছ তুমি—আমি গিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়ালেই সে আগেকার মতো ভালো হ'য়ে যাবে?—সত্যি—সত্যি?

আমি জোর দিয়া কহিলাম, নিশ্চয়ই। আপনি একবার চলুন না—আমার সঙ্গে—

পাগলের মতো চোখ দুইটি বড় করিয়া মাসী বলিল, তা' হলে...চল বাবা—চল—আর দেরী কোরো না—

দুই জনে হন্ হন্ করিয়া গঙ্গা-তীর হইতে উঠিয়া আসিয়া... সদর রাস্তা ধরিলাম।

কালাপাহাড় কোথায় থাকে তাহা আমিও জানি না—যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে-ই নাম শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া পলাইয়া যায়!

অবশেষে সন্ধান মিলিল। মিলিল বলিলে ভুল করা হইবে—রাস্তা হইতে আমাদের ধরিয়া লইয়া গেল।

গিয়া দেখি—সে এক অমানুষিক অত্যাচার। হাজার

হাজার লোকের নাক-কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। তাহাদের আর্ত্তনাদে বুঝি নরকও কাঁপিয়া উঠে!

চাহিয়া দেখি মাসীর চোখ জ্বলিতেছে!

মাসী উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া কালাপাহাড়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, আমাকে আগে নিজে হাতে তুই মেরে ফেল্, তারপর এই অত্যাচার করিস্।

দেখিলাম অবাক কাণ্ড!

যমদূতের মতো যে লোকটার আদেশে এত অত্যাচার হইতে-ছিল, সে একেবারে স্তব্ধ!

সাপের মাথায় যেন ধূলা পড়িল!

তাকাইয়া দেখি—কালাপাহাড়—হ্যাঁ—যে পাষাণেরই মতো নির্ম্মম, তারি চোখে জল!

কালাপাহাড় তার মাসীর পায়ের তলায় পড়িয়া ছেলে-মানুষের মতো কাঁদিতে লাগিল।

মাসী আদেশের স্বরে কহিল, আগে ওদের ছেড়ে দে··· তবেই আমি তোকে বুকে তুলে নেবো—

দলে দলে লোক মাসীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মাসী কালাপাহাড়কে দুই হাত দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল। দেখি মাসীর চোখেও জল।

মাসী আমাকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, এতদিন ধরে কাশীতে আছি···খালি অভিশাপই দিয়েছি···কোনো দিন

গঙ্গার জলে ডুব দিই নি! চল ত' বাবা, আজ গঙ্গার জলে একটা ডুব দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করবো—

মাসীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় গেলাম। মাসী বলিল, দে বাবা,—তুই-ও একটা ডুব দে···তোরি কথায় আজ আমি গিয়েছিলাম—তারি ফলে কত লোক দুর্গতির হাত থেকে নিস্তার পেল···মা গঙ্গা তোর মঙ্গল করবেন—

মাসীর সঙ্গে আমিও ডুব দিলাম—

ভেক্লো

ভাবিয়াছিলাম, গঙ্গাস্নানের পর মাসীর কাছ হইতে বেশ প্রসাদ পাওয়া যাইবে। ওমা! চোখ তুলিয়াই দেখি··· কোথায় মাসী আর কোথায় গঙ্গা! এ যে একেবারে ধূ ধূ মাঠ।

কিছু দূরে দেখি অনেকগুলি ছাউনী পড়িয়াছে—ঠিক সৈন্যদের ছাউনীর মতো।

ভাবিলাম—এই জন-প্রাণী-শূন্য মাঠের মাঝখানে পড়িয়া থাকার চাইতে···ছাউনীর দিকে যাওয়া যাক্···যদি কিছু খাবার-দাবার মেলে!

গঙ্গাস্নানের পর ক্ষিদেটা যেন আরো চাঙা হইয়া উঠিল।

যত কাছে মনে করিয়াছিলাম—ঠিক তত কাছে ত' নয়—পৌঁছিতে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাঁবুগুলির ভিতর হইতে আলো আসিতেছে দেখা গেল।

চুপি চুপি একটা তাবুর পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম। দুটি লোক ফিস্ ফিস্ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে শুনিলাম। আরো একটু আগাইয়া দেখি ছোট্ট একটা জানালার মত রহিয়াছে।

একটা চোখ সেই ছোট জানালার উপর রাখিলাম···মুখটা চেনা-চেনা লাগিতেছে।

ইতিহাসটা ভালো করিয়া পড়া ছিল।

মগজটাকে বেশ করিয়া একটু নাড়া দিলাম।

হ্যাঁ—এইবার মনে পড়িয়াছে—মানসিংহেরই চেহারা বটে! "ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে" দেখিয়াছি—মানসিংহ না হইয়া আর যায় না।

মানসিংহ ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে—

কিন্তু যত আস্তেই কথা বলুক—কথাগুলি আমার কাণে গেল।

মানসিংহ বলিল, তুমি বল কি শ্রীমন্ত—কেদার রায়ের সমস্ত শক্তি নিহিত রয়েছে—ঐ পুরোহিতের মধ্যে? তুমি এসব কথা বিশ্বাস কর?

শ্রীমন্ত বলিল, না—না—আপনি অবিশ্বাস করবেন না মহারাজ মানসিংহ,...ঐ পুরোহিত সিদ্ধপুরুষ...

এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা জলের মতো বুঝিতে পারিলাম।

মহারাজ মানসিংহ আসিয়াছে দিল্লীর বাদশার তরফ হইতে বাঙলার শেষ স্বাধীন রাজা কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিতে, আর...কেদার রায়েরই লোক এই শ্রীমন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সব ঘরের খবর বলিয়া দিতেছে!

কি সাঙ্ঘাতিক লোক এই শ্রীমন্ত! দাঁড়াও—চুপ করিয়া শুনিতে হইবে—ওরা আর কি কি বলে—

মহারাজ মানসিংহ কহিল, শ্রীমন্ত, ও-সব ঠাকুর দেবতা

ঘূর্ণিপাকে—

এই কি সাধু হীরালালের রূপ। এ যে বিরাট কুমীর।

—১০৪ পৃষ্ঠা

আমি বিশ্বাস করি না···তুমি কেদার রায়ের রাজধানীতে পৌঁছেই ঐ পুরোহিতকে বন্দী করবে—আর রাজাকে জানিয়ে দেবে যে, ঐ পুরোহিতই গোপনে আমার সঙ্গে কি যেন সব ষড়যন্ত্র ক'চ্ছিল—বুঝ্লে!

শ্রীমন্ত বলিল, চমৎকার পরামর্শ!

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ছুটিলাম।—এ খবর কেদার রায়কে দিতেই হইবে। কেদার রায়ের যদি দেখা না পাই ত' পুরোহিতের খোঁজ করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিব।

··· ··· ···

ছুট···ছুট···ছুট···

··· ··· ···

কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর—বাঙালীর হাতে গড়া এই রাজ্য। দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

কিন্তু রাজ্যের মাধুর্য্য দেখিবার সময় আমার ছিল না—ছুটিয়া চলিলাম—পুরোহিতের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বহু অনুসন্ধানের পর পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তারপর ধীরে ধীরে সব কথাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম।

তিনি শুনিয়া কহিলেন, হিন্দুর সর্ব্বনাশ হিন্দু যেমন করে করেছে···এমন আর বাইরের কোনো জাত নয়। যাই হোক···

আজ রাত্রেই আমি রাজা কেদার রায়ের সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌বো—

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, তুমি খুব দরকারী সংবাদ এনেছ…তোমার পরিচয় কিছু পেলাম না…কিন্তু রাজা কেদার রায়ের রাজ্য যদি টেঁকে ত তোমার জন্যেই টিক্‌বে। তুমি কাল সকালে একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো—

আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি মনে করিয়া রাত্রে এক পান্থ-নিবাসে আশ্রয় লইয়া খুব মনের আনন্দে ঘুমাইলাম। সকাল-বেলা ঘুম ভাঙিতেই পুরোহিত মহাশয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে।

আমার সাড়া পাইয়া পুরোহিত মহাশয়ের ছেলে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, বাবার কাছে আপনার সব কথাই শুনেছি…কিন্তু তিনি রাজার কাছে যাবার পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত এসে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেছে…এবং রাজ্যময় ঘোষণা করে দিয়েছে যে আমার বাবা গোপনে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে মহারাজ ক্ষেপে গেছেন! বিচারে বাবার কি হবে কিছুই জানা যায়নি।

আমি কহিলাম, তা' হলে উপায়? আচ্ছা, তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে আপনি জানেন?

তিনি কহিলেন, রাজবাড়ীর পিছনের কারাগৃহে।

কহিলাম, যেমন করে পারি আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

কারাগৃহের পিছনে প্রকাণ্ড এক বাগান। প্রাচীর টপকাইয়া সেই বাগানের একটা ঝোপের ভিতর লুকাইয়া রহিলাম।

দেখিলাম বন্দীরা তখন অনেকে বাগানে পাইচারী করিতেছে। অনুমানে বুঝিলাম পুরোহিত মহাশয়ও একবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দিকে আসিতে পারেন।

খাপ্‌টি মারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ দেখি সেই ঝোপের পাশে আসিয়া পুরোহিত বসিলেন।

পিছন হইতে তাঁহার গায়ে হাত দিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ইসারায় তাঁহাকে চীৎকার করিতে বারণ করিলাম, —এবং কেদার রায়ের রাজ্য রক্ষার জন্য আমি তাঁহার কোনো উপকারে লাগিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম।

মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, রাজা এখন শ্রীমন্তের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছেন···প্রকৃত ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জান্‌তে পাচ্ছেন না—

আমি কহিলাম, যদি আমি তার সঙ্গে দেখা করে আপনার কথা বলি ?

পুরোহিত কহিলেন, তাতে আরো হিতে বিপরীত হ'বে। শ্রীমন্তের বাক্‌চাতুর্য্যে আমার কোনো কথা আর তিনি শুন্‌তে পারবেন না। উল্টে রেগে গিয়ে তোমাকেও বন্দী করবেন।

আমি বলিলাম, তাহলে কি রাজ্য রক্ষার কোনো উপায়ই নেই ?

চোখ বুজিয়া খানিকটা কি ভাবিয়া পুরোহিত কহিলেন, একটা উপায় আছে—কিন্তু তুমি কি পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারবো—আপনি বলুন না !

পুরোহিত কহিলেন, কোনো রকমে রাজার সঙ্গে দেখা করে যদি তাঁকে বলতে পারো যে, অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা ঠিক যেখানে মিশেছে—সেইখানে যদি তিনি স্নান করতে পারেন তবে তাঁর জয় স্থির-নিশ্চয়।

আমি উৎসাহিত হইয়া কহিলাম, আপনার নাম করে বল্‌ব ত ?

পুরোহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না—না—না। আমি ত' তোমাকে বল্লুম—আমার নাম তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তুমি এক কাজ কর, গিয়ে বল যে স্বপ্নে তুমি আদেশ পেয়েছ। আমাদের রাজা পরম ধার্ম্মিক···একথা শুনে নিশ্চয়ই তিনি ব্রহ্মপুত্র স্নানের ব্যবস্থা করবেন।

খোঁজ নিয়া জানিলাম—অতি প্রত্যূষে মহারাজ নদীর তীরে ভ্রমণ করেন। পরদিন সেই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া পুরোহিতের শেখানো মত কথা তাঁহাকে বলিলাম।

তিনি বলিলেন, হ্যাঁ মোগল আস্‌ছে। সে সংবাদ আমি পেয়েছি। বেশ অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান আমি করবো। কিন্তু ঠিক কোথায় দুটো নদী মিশেছে···তা জানা যাবে কি করে ?

এই প্রশ্ন উঠিবে তাহা আগেই ভাবিয়াছিলাম—এবং

পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসাও করিয়া আসিয়াছিলাম। কহিলাম, আপনি ভাটির টানে একটি কমলা ছাড়িয়া দিবেন—যেখানে দুইটি নদী মিশিয়াছে—স্বয়ং ব্রহ্মপুত্রদেব সেইখানে জল হইতে হাত বাহির করিয়া আপনার কমলালেবু গ্রহণ করিবেন।···সেই যায়গায় স্নান করিলেই আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

রাজা কেদার রায় এই সংবাদ শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি স্রোতের জলে কমলালেবু ছাড়িয়া দিলেন। অনেকটা চলিবার পর সকলকে অবাক্ করিয়া বালা-পরা ব্রহ্মপুত্রদেবের একটি হাত জল হইতে বাহির হইয়া রাজার কমলা গ্রহণ করিল।

কেদার রায় আদেশ দিলেন, এইখানে প্রকাণ্ড এক ঘাট তৈরী করতে হ'বে—আর সে ঘাটের নাম দেওয়া হবে 'কমলা ঘাট'।

শ্রীমন্ত দেখিল সমূহ বিপদ। সে রাজমিস্ত্রীদের সব হাত করিয়া ঘাট কিছু দূরে হটাইয়া দিল—ফলে মহারাজের অষ্টমী স্নান হইল বটে কিন্তু পুরোহিত মহাশয়ের আদেশ অনুসারে হইল না।

আমি সে কথা জানিতে পারিয়া যথাসময়ে পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া শ্রীমন্তের নষ্টামির সব কথা খুলিয়া বলিলাম।

পুরোহিত মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন, তবে উপায় ?···

তারপর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন, আছে আর এক পন্থা। কিন্তু সেই পথই শেষ পথ।

আমি কহিলাম, কি সে উপায়?

পুরোহিত কহিলেন, তবে শোনো—আমি মা কালীর পূজো করতে চাই—কিন্তু তার জন্যে প্রথমেই দরকার প্রতিমার। এই প্রতিমা আমি কারাগারে কোথায় পাবো?

ছেলেবেলায় একটু একটু ছবি আঁকিতে পারিতাম; তারপর কুমোরদের ছেলের সঙ্গে মিশিয়া বেশ ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তিও গড়িতে শিখিয়াছিলাম।

বলিলাম, সেজন্য আপনি কিছু ভাব্‌বেন না পুরুত ঠাকুর, রাজবাড়ীতে যেমন কালীমূর্ত্তি আছে, ঠিক ঐ রকমই ছোট মূর্ত্তি আমি গড়ে দেবো। কিন্তু তারপর?

পুরোহিত কহিলেন, তারপর পূজো শেষ হ'য়ে গেলে মহারাজ এসে যদি ভক্তিভাবে সেই নির্ম্মাল্য ধারণ করেন ত' তিনি হ'বেন অপরাজেয়।

আমি উঠিয়া বসিয়া জবাব দিলাম, তা' হ'লে আপনি একেবারে মন স্থির করে ফেলুন—আমি আগামীকালই প্রতিমা তৈরী করে এনে দেবো।

পূজা হইল—পুরোহিত মহাশয়ও নির্ম্মাল্য লইয়া প্রস্তুত। এইবার রাজা কেদার রায়কে আনিতে হইবে—

আমি উৎসাহিত হইয়া ছুটিলাম···রাজার সন্ধানে। খবর পাঠাইতে···তিনি আমায় ডাকিলেন বটে কিন্তু পুরোহিত

ঠাকুরের নাম শুনিয়াই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তার নাম আর আমার সম্মুখে কেউ যেন মুখে না আনে—আমি সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের মুখ দেখ্‌তে চাই না।

রাজাকে এত করিয়া বুঝাইলাম—কিন্তু তিনি অটল—অচল! বুঝিলাম, শ্রীমন্ত বাহাদুর লোক বটে! পুরোহিতের বিরুদ্ধে রাজার মন একেবারে বিষাক্ত হইয়া আছে।

সব কথা শুনিয়া পুরোহিত তাঁহার হাতের নির্ম্মাল্য নিকটস্থ এক গাছের মাথায় ফেলিয়া বলিলেন, রাজা যে অর্ঘ্যকে অবহেলা করলেন—সেই নির্ম্মাল্যের পরশ পেয়ে ঐ গাছ অমর হবে।

হঠাৎ কিসের কোলাহলে আমরা দুইজনে সচকিত হইয়া উঠিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চোখ দুইটি অকস্মাৎ বড় হইয়া গেল।

একদল শ্রীমন্তের লোক—আমাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। বোধ করি ইতিমধ্যে আমার রাজার কাছে যাওয়ার সংবাদ পাইয়াছে।

আর অপেক্ষা করিবার উপায় নাই—সৈন্য-সামন্ত প্রায় ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল—মুহূর্ত্তমধ্যে লাফাইয়া উঠিয়া, দেয়াল টপ্‌কাইয়া যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিতে লাগিলাম।

চৌদ্দ

গভীর রাত্রে প্রাণভয়ে পলাইতেছিলাম—কোন্ দিকে ছুটিতেছিলাম তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না। হঠাৎ পাশে ছলাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল।

তবে কি আমি কোনো নদীর পাশ দিয়া ছুটিতেছি!

ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কে?

আস্তে আস্তে তাহার জবাব আসিল। মানুষের ভাষায় কে কথা কহিল, কিন্তু যেন মানুষ নয়! কহিল, আমি সাধু হীরালাল।

সাধু হীরালাল!

কৈ এরকম কোনো সাধুর ত' নাম শুনি নাই! কহিলাম, সাধু যদি, তবে এই গভীর রাত্রে তুমি জলের ভেতর কেন?

জবাব আসিল, দাঁড়াও—আমি আস্‌ছি।

হঠাৎ পায়ের কাছে ভুস্ করিয়া একটা শব্দ হইতে, সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া আতঙ্কে সাত হাত পিছাইয়া গেলাম।

এই কি সাধু হীরালালের রূপ!

এ যে বিরাট কুমীর!

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার···কুমীর মানুষের মতো কথা কহিতে লাগিল।

বলিল, ত্যাখো ভাই, আমার অনেক দুঃখের কাহিনী আছে

…যদি দয়া করে বোসো…নিরিবিলি সব কথা তোমায় বলি—

দেখিলাম…পিছনের বিপদ যখন কাটাইয়াছি…তখন সে ভয়টা আর নাই। তবু কহিলাম, দেখ, দিনের বেলা এলে হয় না?

কুমীর-বেশী হীরালাল আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, ওরে বাপ্ রে!—তা' হ'লে কি আর রক্ষা আছে! সবাই লাঠি-সোটা বন্দুক নিয়ে আমায় মারতে আস্‌বে। আমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে তোমারও দয়া হ'বে—বোসো ভাই বোসো—

উপায়ান্তর না দেখিয়া বসিয়া পড়িলাম।

হীরালাল কহিল—

সে অনেক কথা। মনের দুঃখে বহুদিন আগে সংসার ছেড়ে কামাখ্যা চলে যাই। জানো তো সেখানে সব ভৈরবীরা মন্ত্র দিয়ে মানুষকে বশ করে রাখে?

কামাখ্যাতে ঐ রকম এক ভৈরবীর পাল্লায় আমি পড়েছিলাম। ভৈরবী আমাকে মন্ত্রবলে ভেড়া করে রেখে দিয়েছিল।

অনেক দিন ঐ রকম ছিলাম। তারপর কি জন্য আমার ওপর ভৈরবীর দয়া হ'ল। সে আমাকে মন্ত্রবলে আবার মানুষ করলে। আমি সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে সুখী করলাম। ভৈরবী আমাকে তার শিষ্য করে নিতে রাজী হ'ল।

বহুদিন ধরে…ভৈরবীর কাছে মন্ত্র-তন্ত্র শিক্ষা করলাম। তারপর হঠাৎ যেন কেমন ইচ্ছে হ'ল—নিজের আত্মীয়-স্বজনের

কাছে ফিরে যাই···আমার এই অলৌকিক গুণ তাদের দেখিয়ে অবাক্ করে দি!

আমার এই মনের কথা ভৈরবীকে জানালাম। ভৈরবী মাথা নেড়ে বল্লে, তা হ'তে পারে না—এখন লোকালয়ে ফিরে গেলে তুমি ঐ মন্ত্রের জন্যেই বিপদে পড়বে!

তখন তার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ভাবলাম, আমি মন্ত্র-তন্ত্রের সব কিছু শিখে নিয়েছি···আমার আবার বিপদ কি!

ভৈরবীকে না জানিয়ে একদিন গভীর রাত্রে কামাখ্যা ছেড়ে পালালাম।···চলে এলাম বাড়ীতে—বাড়ীর সবাই প্রথমটা আমাকে দেখে চিন্‌তেই পারলো না—তারপর পরিচয় দিতে হেসে উড়িয়ে দিল।

আমি তখন তাদের সব কাহিনী খুলে বল্লাম। কি ভাবে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই—কি করে কামাখ্যাতে ভৈরবীর ওখানে তন্ত্র-মন্ত্র শিখি।

পাড়ার কয়েকজন ধরলে, বেশ, তুমি যদি তন্ত্র-মন্ত্র শিখে থাকো···আমাদের দেখিয়ে তা প্রমাণ কর।

আমি লাফিয়ে উঠে বল্লাম, নিশ্চয়ই—কি তোমরা হ'তে বল আমাকে? তোমাদের চোখের সাম্‌নে মুহূর্ত্তমধ্যে তোমরা যে জানোয়ারের কথা বল্‌বে—আমি তাই-ই হ'বো—

ওর ভেতর থেকে এক ছোক্‌রা চেঁচিয়ে উঠে বল্লে,···হও দেখি কুমীর!

সবাই ওর কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—···কুমীর—কুমীর—কুমীরই আমরা দেখ্‌তে চাই···।

খবর পেয়ে···গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই এসে হাজির হ'ল। আমি তখন দুটো মাটির কলসী আন্‌তে বল্লাম। তারপর শুদ্ধ মনে স্নান করে···দুই কলসী জল ভরে···তাকে মন্ত্রপূত করে নিলাম।

তারপর উপস্থিত সবাইকে বল্লাম, দেখো, এইখানে দুই কলসী জল আছে। প্রথম কলসীটির জল আমি নিজেই মাথায় ঢেলে দেবো—আর সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে যাবো প্রকাণ্ড এক কুমীর। তারপর তোমরা একজন দ্বিতীয় কলসীর জল আমার গায়ে ঢেলে দিলে আমি আবার মানুষের দেহ ফিরে পাবো।

যে ছোক্‌রা আমায় কুমীর হ'তে বলেছিল—সে এগিয়ে এসে বল্লে, বেশ, তুমি প্রথম কলসীর জল মাথায় ঢালো—দ্বিতীয় কলসীর জল ঢেলে দেওয়ার ভার রইল আমার ওপর।

গ্রামের সবাই চীৎকার করে তাতে সম্মতি দিলে।

নিজের গুণপনা দেখাবার জন্যে আমি তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছি—আর কোনো কথা না বলে—প্রথম কলসীর জল মাথায় ঢেলে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেলাম এক—প্রকাণ্ড কুমীর। ঐ দৃশ্য দেখে···গ্রামের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যে যেখানে ছিল প্রাণের ভয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

সেই সাহসী ছোক্‌রা যে আমার গায়ে দ্বিতীয় কলসীর জল

ঢেলে দেবে বলে কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিল—সেও ভয় পেয়ে যেই পালাতে যাবে—অমনি সেই কলসী পড়ে ভেঙে গেল···মন্ত্রপূত সেই জল গেল মাটিতে গড়িয়ে।

আমি দেখলাম—আমার মানুষ হ'বার আর কোনো উপায়ই নেই—তখন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটলাম আমি নদীর দিকে! সামনেই ছিল আত্রাই নদী···তাতেই এসে আশ্রয় নিলাম।

সেই থেকে আমি নদীর জলে ভেসে বেড়াচ্ছি। কুমীরের দেহ হ'লে হ'বে কি···আমি মানুষ ত'···যদি এইভাবে আরো কিছুদিন থাকতে হয় ত' ক্ষিদের চোটেই আমি মারা যাবো—

আমি বলিলাম, তা তুমি গ্রামবাসীদের ডেকে বল্লে না কেন ?

সাধু-হীরালাল জবাব দিল, আমার কথা তখন শুনবে কে ? সবাই প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। তারপর মন্ত্রের জল ছাড়া ত' আমি আর মানুষ হ'তে পারবো না! কেবল সেই ভৈরবী পারবে আমাকে মানুষ করতে, আর কেউ নয়।

ভাই, তুমিও ত' মন্ত্রপূত লোক—আমি জানি! তুমি যদি কামাখ্যা গিয়ে আমার ভৈরবীকে এখানে নিয়ে এসো, তবেই আমি মানুষ হ'তে পারি—নইলে নয়।

সাধু-হীরালাল—সত্যিই মানুষের মতো আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মন্ত্রপূত হইয়া থাকায় যে কি দুঃখ ও বিপদ তা' আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছি। সাধু-হীরালালের জন্য সত্যই কষ্ট

হইল। মনে মনে স্থির করিলাম, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কুমীরবেশী হীরালালকে আবার মানুষ করিয়া তুলিব।

তাহার কাছে রাজীও হইলাম। বলিলাম, সত্যিই আমরা দু'জনে একই ব্যথার ব্যথী। আমি চল্‌লাম কামাখ্যায়··· যে করেই হোক···হাতে-পায়ে ধরে ভৈরবীকে এখানে নিয়ে আস্‌ব।

* * *

সব কথা শুনিয়া ভৈরবী বলিল, তুমি একদিন আমার এখানে অপেক্ষা কর। আমাকে যোগবলে সব কথা জেনে নিতে হ'বে।

উপায় নাই। কামাখ্যায় এক দিন বসিয়া রহিলাম।

যোগ শেষ করিয়া ভৈরবী উঠিয়া বসিল। তারপর বলিল, হীরালাল কুমীর অবস্থায় ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য খেয়েছে—তার দেহ এখন অপবিত্র···তাই মন্ত্রপূত জল আর তাকে মানুষ করতে পারবে না···কাজেই তাকে মানুষ করা এখন আমার ক্ষমতার বাইরে।

ভৈরবী শুকতারার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, তবু আমি হীরালালের জন্যে চেষ্টা করবো। আমি তোমার সঙ্গে খানিকটা মন্ত্রপূত জল দিয়ে দেবো—সেইটে ওর গায়ে ঢেলে দিলে সে হবে মকর—

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম,—মকর ?—কিন্তু মকর হয়ে ওর লাভ ?

ভৈরবী বলিল, লাভ আছে বৈকি! মকর হওয়ার পর··· ভাটির টানে···হীরালাল চল্‌তে চল্‌তে যদি গঙ্গায় গিয়ে পড়তে পারে তবে সে উদ্ধার হয়ে যাবে এ কথা নিশ্চয়—; তাই আমি সেই জল এই ঘটে করে নিয়ে এসেছি—নাও—যত শীগ্‌গির পারো চলে যাও।

*　　　*　　　*

হীরালাল বলিল, তা' হ'লে আমাকে মকর হতে হবে?

আমি জবাব দিলাম—তা' ছাড়া আর উপায় কি ভাই?

হীরালাল কিছুক্ষণ কথা বলিল না···তারপর···করুণ স্বরে কহিল···ক্ষিদেয় আমার প্রাণ যায়—মকর করবে, করে যাও··· কিন্তু কোনো যায়গা থেকে যদি পাত-কুড়োনো ভাতও কিছু পাও···আমায় খাইয়ে যেও ভাই···নইলে কাল হয়ত' এমনিই মারা যাব।

রাজী হইলাম।

যাইবার আগে সেই ভৈরবীর দেওয়া মন্ত্রপূত জল— কুমীরবেশী হীরালালের গায়ে ঢালিয়া দিতেই চক্ষের নিমেষে সে মকর হইয়া গেল!

মকর কখনো জীবনে দেখি নাই···পঞ্জিকায়···ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ছবি দেখিয়াছিলাম। বেশ মনে আছে··· চাহিয়া দেখি···হীরালালের অবিকল সেই রকম চেহারা হইয়াছে!

আসিবার সময় হীরালাল আবার মিনতি করিয়া বলিল,

ভিন্ দেশের লোক! শোনোনি বুঝি নদীতে একটা প্রকাণ্ড কুমীর এসেছে…কোন শিকারী যেন গেছে বন্দুক নিয়ে তাকে মারতে…আর লোকজন ছুটেছে সব তামাসা দেখ্তে!

আমার মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই কালো হোঁৎকা লোকটা যে এতদূর পর্য্যন্ত ধাওয়া করিবে তাহা ভাবি

আ্যাগন্ট।

বহু লোক জুটিয়াছে। পাণপণে ছুটিলাম। জীবনে এমন ছোটা

আমি গিয়া সেই মোটা লো..

কহিলাম, মশাই…একটা জলজ্যাণ্ড

-ইনর।

করতে যাচ্ছেন?…

লোকটা তাহার বিশাল ভুঁড়ি নাচাইয়া বত্রিশ-পাটি দাঁত বাহির করিয়া কহিল, খুব গাঁজায় দম দিতে শিখেছ বুঝি ছোক্রা?

নদীর পথ ছাড়িয়া অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক গেরস্থ বাড়ী চোখে পড়িল।

ইতিমধ্যে ভয়ানক রোদও উঠিয়াছিল। বাহির বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া হাঁক দিলাম…অতিথ্কে দুটি ভাত দিতে পারো মা?

আমার ডাক শুনিয়া একটি বর্ষীয়সী মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন।

লোকটাই বটে—পরপর দুইটি গুলিতে হীরালালকে আহত করিয়াছে···একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখটা ভাসিয়া উঠিল··· দেখিলাম, ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে!

হয়ত হীরালাল ভাতের আশায় এতক্ষণ নদীর এই বাঁকেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল— ; দুর্দ্দান্ত শিকারী তাহাকে দেখিতে পাইয়া মহা উল্লাসে গুলি করিয়াছে···!

মাথাটা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, আর কিছু ভাবিতে পারিলাম না···হীরালালের উদ্দেশ্যে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম —ডাকিলাম—হীরালাল।

কিন্তু আমার ডাকে হীরালালের পরিবর্ত্তে যে মাথা [illegible] তাহা সে আমাদের ক্লাশেরই গোপ্‌লা। আমি ত' অ[illegible] [illegible] —গোপ্‌লা তুই! [illegible]রিয়া গেলে দেরী [illegible]তর দিয়া চলিলাম।

[illegible] চলিবার পর···দেখি কাতারে কাতারে লোক নদীর দিকে ছুটিতেছে।

একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ হে,···এত লোক কোথায় চলেছে···এদিকে মেলা-টেলা আছে বুঝি?

লোকটা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, ও! তুমি

হরিদ্বারের সন্ন্যাসী হইতে সুরু করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলাম।

সে ভয়ানক জোরে জোরে হো-হো শব্দে হাসিতে লাগিল। তারপর সকলকে ডাকিয়া আমার গল্প শুনাইয়া দিয়া কহিল— কাল রাত্রে খুব খেয়েছিলি বুঝি—তাই এই সব আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছিস্?

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম, স্বপ্ন? তুই বলিস্ কি?

সবাই কহিল, তবে দেখি সেই হরিদ্বারের সন্ন্যাসীর দেয়া আংটি।

আমি আঙ্গুলের দিকে চাহিলাম। সব মনে পড়িল, কহিলাম, সে ত' হবুচন্দ্র রাজার মেয়ে নিয়ে গেছে।

গোপ্‌লা কহিল, ও তাই তোমার গবুচন্দ্রের মত বুদ্ধি হয়েছে!

সবার কি হাসি!

আমি মাথা চুল্‌কাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তবে কি এতদিন অতীত যুগে ছিলাম, এইখানে বরাবর আমার একটা সূক্ষ্ম দেহ চলাফেরা করিয়াছে! হবেও বা!

তবু কহিলাম, তোরা বিশ্বাস কর—আমি বেদব্যাসের আশ্রমে গিয়াছিলাম।

সবাই আবার হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

গোপ্‌লা কহিল, খুব গল্প লিখ্‌তে সুরু করেছিস বুঝি রনু?

আর একদিন সবাইকে ডাকিয়া ব্যাপারটা বুঝাইতে

গিয়াছিলাম—কিন্তু আমার কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না। সবাই শুধু আপন মনে হাসে।

গোপ্‌লা ত' শাসাইয়া গিয়াছে এরপরও যদি আমি হরিদ্বারের সন্ন্যাসীর গল্প তুলি—ত' সবাই নাকি চাঁদা তুলিয়া রাঁচির টিকিট কিনিয়া আমায় ট্রেনে তুলিয়া দিবে।

সেই হইতে ভয়ে আর ওকথা কাহাকেও বলি না। কিন্তু আমার সব কথাই যে সত্য তা' বুঝাইব কি করিয়া!